আকাইদ ও নৈতিক জীবন

ইউনিট ১

ভূমিকা

আকাইদ (عَقَائِدُ) আকীদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দের বহুবচন। আকীদা মানে বিশ্বাস, অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস। মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকীদা বলা হয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বিষয়ক এই বিদ্যাকে আকাইদ শাস্ত্র বলা হয়। ইসলাম আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান। ইসলামে রয়েছে মানব জীবনের ইহকালিন ও পরকালীন সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা। ইসলামি জীবন বিধানের দুটো দিক আছে। একটি বিশ্বাসগত দিক, আরেকটি আচরণগত বা ব্যবহারিক দিক। ইসলামের বিশ্বাসমূলক দিকের নামই হলো আকাইদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, নবি-রাসূল, মালাইকা, আসমানি কিতাব, তাকদির, আখিরাত, হাশর-নশর, পুলসিরাত, মিজান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়সমূহে বিশ্বাস আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। একজন মানুষ মুসলিম হতে হলে এ বিষয়সমূহের প্রতিটির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এই বিশ্বাসের নাম ঈমান। আকাইদের বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। ইমান আনার পর মানুষ দৈনন্দিন যা কিছুই করবে তা ইসলামের বিধান ও নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরিচালনা করতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে কল্যাণ লাভ করবে।

ভালো ও মন্দের দিক দিয়ে মানুষের কাজগুলো দুভাগে বিভক্ত। ভালো ও সৎ কাজকে সুনীতিমূলক কাজ বলা হয়। আর মন্দ ও অসৎ কাজকে নীতিবর্জিত বা অনৈতিক কাজ বলে। নৈতিকতা মানে নীতি সংক্রান্ত বিষয় ও কাজ। ধর্ম ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক। কেননা, ধর্মের প্রায়োগিক ও আচরণিক বিধি এবং নিয়ম-নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। উত্তম নৈতিকতা পাওয়ার একমাত্র উৎস হলো ধর্ম। ধর্ম বিশ্বাসই নৈতিকতার মাপকাঠি। সমাজ-সভ্যতা ও ধর্মের বিভিন্নতার কারণে নৈতিকতায় কিছু তারতম্য দেখা গেলেও সবাই মানবিকতা, দয়া-মায়া, সততা, ন্যায়পরতা, ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সাম্য-মৈত্রী ইত্যাদি সুনীতিমূলক কথা-কাজ, আচার-আচরণকে নৈকিতা হিসেবে জানে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ২১ দিন।**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-১	:	ইসলামের পরিচয় ও ভিত্তি
পাঠ-২	:	ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা
পাঠ-৩	:	ইসলাম শিক্ষার পরিচয় ও গুরুত্ব
পাঠ-৪	:	ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক
পাঠ-৫	:	ইমানের ৭টি মূল বিষয়
পাঠ-৬	:	আল্লাহ তায়ালার পরিচয়
পাঠ-৭	:	কুফর
পাঠ-৮	:	তাওহীদ
পাঠ-৯	:	শিরক

পাঠ-১০	:	নিফাক
পাঠ-১১	:	মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব
পাঠ-১২	:	নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে আকাইদ শিক্ষা
পাঠ-১৩	:	রিসালাত
পাঠ-১৪	:	নবি-রাসূলগণের গুণাবলি ও নবুওয়াতের ধারা
পাঠ-১৫	:	সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি
পাঠ-১৬	:	খতমে নবুওয়াত
পাঠ-১৭	:	আসমানি কিতাব
পাঠ-১৮	:	আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য
পাঠ-১৯	:	নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা
পাঠ-২০	:	আখিরাত
পাঠ-২১	:	জান্নাত ও জাহান্নাম

পাঠ-১ : ইসলামের পরিচয় ও ভিত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনিত একমাত্র দীন, দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন।
- ইসলামের মূলভিত্তি কী কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইসলাম, সালাত, সাওম, যাকাত, রমযান, হজ্জ, বুনিয়াদ, ইলাহ।

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম (الإِسْلَام) শব্দটি আরবি। এটি সিলমুন (سِلْمٌ) ও সালামুন (سَلَامٌ) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ- আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, বিনীত হওয়া, শান্তির পথে চলা, নিরাপদে থাকা, নিরাপত্তা লাভ করা ইত্যাদি।

পরিভাষাগতভাবে ইসলাম হচ্ছে- আল্লাহর অনুগত হওয়া, আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। বিনা দ্বিধায় তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবন যাপন করা। যিনি ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন তিনি হচ্ছেন মুসলিম (مُسْلِمٌ)।

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" (সুরা আলে ইমরান ৩:১৯)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫)

ইসলামের মূলকথা হলো, আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ধর্মাদর্শের অনুসরণ করা যাবে না। যদি এমনটি কেউ করে, তবে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থাৎ জাহান্নামবাসী হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম রাখেন ইসলাম এবং উম্মতকে মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত উম্মত করো।" (সুরা বাকারা ২:১২৮)

ইসলামের ভিত্তি

ইসলাম যে পাঁচটি মূল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পাঁচটি বুনিয়াদকে ইসলামের মূলভিত্তি বলা হয়। মহানবি (স) বলেন-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে 'আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।" (সহিহ বুখারী, মুসলিম)

এ হাদিস থেকে আমরা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি সম্পর্কে জানলাম। এ পাঁচটি ভিত্তির কোন একটিকে অস্বীকার করা যাবে না। ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোকে একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করা যায়। তাঁবুর যেমন পাঁচটি খুঁটি থাকে, ইসলামেরও তেমনি পাঁচটি স্তম্ভ আছে। ইমান হলো তাঁবুর মাঝখানের খুঁটি। মাঝখানের খুঁটি ছাড়া তাঁবু যেমন তৈরি করা যায় না, তেমনি ইমান ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইসলামের অন্যান্য ভিত্তি হলো, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ। সব খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু যেমন ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি এ পাঁচটি বিষয় ঠিকভাবে পালন করলে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়। একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম অর্থ- আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম সর্বপ্রথম নবি ও রাসূল আদম (আ) থেকে নিয়ে মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবি ও রাসূলের দীন তথা জীবন ব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মদ (স) ব্যতিত সকল নবি-রাসূলের দীন রহিত হয়ে গেছে। কাজেই মুহাম্মদ (স) আনীত দীন সকল মানুষকে মেনে চলতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রচারিত দীনকে ইসলাম এবং তাঁর উম্মতকে মুসলিম বলা হয়। তবে আমাদেরকে সকল নবি ও রাসূল এবং তাঁদের নবুওয়াতের উপর ইমান রাখতে হবে; তবে তাঁদের শরিয়তের অনুসরণ করা যাবে না। ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি। আল্লাহর একত্ববাদে এবং মুহাম্মদ (স) এর রিসালাতে বিশ্বাস করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা। মুসলমানদের জীবনের সকল কাজ ইসলামের বিধানের আলোকে সম্পাদন করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি / শিক্ষার্থীর কাজ	ইসলামের বুনিয়াদ সংক্রান্ত হাদিসটি শিক্ষার্থীরা অর্থসহ মুখস্থ করবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে নিকটাত্মীয়দের কাছে হাদিসের বাণী পৌছে দিবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. যিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন তাকে বলা হয়-
ক. মুমিন খ. মুসলিম
গ. মুত্তাকী ঘ. নামাযী

২. ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে-
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৩টি

৩. ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা, কারণ এতে রয়েছে-
ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা খ. সকল সমস্যার সমাধান ও দোজাহানের কল্যাণ
গ. ধন-সম্পদ লাভের উপায় ঘ. মরুবাসীর জন্য দিকনির্দেশনা।

উত্তরমালা: ১.খ, ২. খ ৩. খ

পাঠ-২ : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' আল-কুরআনের আলোকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ত্রিত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, বহুত্ববাদ, একত্ববাদ, শরিয়ত, জীবনব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-বর্ণ।

পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধর্ম পালন করে থাকে। কোন কোন মানুষ এক স্রষ্টার পরিবর্তে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসের আলোকে তারা ধর্মীয় রীতি নীতি ও কাজ কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর, ভগবান বা দেব-দেবীর সন্তুষ্টির চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা লাভের আশা করে। ইসলামি শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। সকল নবি-রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থা হচ্ছে

ইসলাম। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকসহ সকল দিক ও বিভাগের নীতিমালা প্রদান করেছে। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। এতে কোন প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা নেই। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সুরা আল-মায়িদা ৫:৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি আপনার প্রতি স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (সুরা আন-নাহল, ১৮:৮৯)

উক্ত আয়াত দুইটি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান কুরআনে রয়েছে। এতে রয়েছে সকল মানুষের জীবনের সামগ্রিক দাবি-দাওয়া, অভাব-অনটন ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম ও বলিষ্ঠ নীতিমালা। ইসলামে রয়েছে মানব চরিত্রের সকল গুণাবলির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের নীতিমালা। ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতি সম্বলিত শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক গতিশীল আধুনিক সমাজ ও বিশ্ব গঠন এবং সংরক্ষণের ভারসাম্যপূর্ণ বিধি-বিধান।

মানব জাতির জীবন যাপন পদ্ধতির পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে দেওয়া হয়েছে। এ জীবন ব্যবস্থায় কোন অপূর্ণতা নেই। এতে নতুনভাবে কোন কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই।

ইসলাম দেশ-কাল-জাতি, গোত্র, বংশ ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল যুগের সকল মানুষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

ইসলাম ব্যক্তি জীবনকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে, পবিত্র- পুণ্যময় জীবন যাপনের নীতিমালা দিয়েছে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। ইসলাম মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, দাদা-দাদীসহ সকলকে নিয়ে পারিবারিকভাবে জীবন যাপন করার জন্য দিয়েছে সুষ্ঠু নীতিমালা।

সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলামের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। সকল মানুষই আদম (আ)-এর সন্তান। ইসলামের শিক্ষা হলো মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ বা পার্থক্য নেই। এক জাতি, আরেক জাতি, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উপর গর্ব করার কিছু নেই। ইসলাম সমাজের সকলকে মিলে মিশে একত্রে বসবাস করার বিধান দিয়েছে।

একটি রাষ্ট্রের মাঝে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে। ইসলামের এই নীতিমালা অনুসরণ করলে পৃথিবীবাসী সকল প্রকার হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে। ইসলামে কোন সম্প্রদায়িকতাও সংকীর্ণতার স্থান নেই।

মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড অর্থ সম্পদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই ইসলাম সৎ ও হালালভাবে আয় উপার্জন করার বিধান দিয়েছে। ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল করেছে এবং সুদকে হারাম করেছে। হালাল উপার্জনকে ফরয হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম গরিব-ধনীর বৈষম্য নিরসন করার জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলাম অপব্যয়কে নিরুৎসাহিত এবং মিতব্যয়কে উৎসাহিত করেছে।

ব্যক্তিচরিত্র ও নৈতিকতার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য ইসলামের নীতিমালা খুবই চমৎকার। ইসলাম ধর্ম অনুশীলন করলে মানুষ অনাচার ও অনৈতিকতার পংকিলতা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য ইসলামের যুগোপযোগী বিধান রয়েছে। ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অন্য সকল জাতি ও দেশের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সর্বাধুনিক ও পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও স্পষ্ট পথনির্দেশনা দিয়েছি।" (সূরা মায়িদা ৫:৪৮) আল-কুরআনের এ দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরয করেছে। ইসলামে জ্ঞান অর্জন করে উন্নত সমাজ, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা গড়ে তোলার আহ্বান রয়েছে।

আধ্যাত্মিক শক্তি, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক চেতনা ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ে ইসলাম ভিত্তিক জীবন যাপন করলে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়।

তাই মানুষের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ার লক্ষ্যে ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। আদমের সন্তান হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এ ধারণা মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, রাষ্ট্রের এবং বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা নেই। সকল নবি ও রাসূলের দীন হলো ইসলাম। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স)-এর আনীত জীবন বিধানের উপর সকল মানুষকে ইমান গ্রহণ করতে হবে। তাঁর প্রচারিত শরিয়ত জীবনের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মেনে চললে সমগ্র বিশ্ববাসী শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। আমাদের সকলের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করবেন। সাধারণ মানুষকে আলোচনা সভায় দাওয়াত দিবেন সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা"-এ কথাটি আমরা জানতে পারি-
   ক. আল-কুরআনের মাধ্যমে
   খ. আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মাধ্যমে
   গ. ইতিহাসের মাধ্যমে
   ঘ. দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে

২. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম উৎস হলো-
   ক. আল-কুরআন
   খ. আল-হাদিস
   গ. ইমামগণের গবেষণা
   ঘ. 'ক' ও 'খ' নং উত্তর

৩. চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলির দিক দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন-
   ক. হযরত মুহাম্মদ (স)
   খ. হযরত ইসা (আ)
   গ. হযরত আবু বকর (রা)
   ঘ. হযরত উমর (রা)

৪. 'আবদুল কবীর সাহেব একজন মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে চান' সে জন্য তিনি আনুগত্য করবেন-
   ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর
   খ. ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর
   গ. হযরত ইসা (আ)
   ঘ. খলিফা হযরত আলি (রা)-এর।

উত্তরমালা: ১.ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক

পাঠ-৩ : ইসলাম শিক্ষার পরিচয় ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

- ইসলাম শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন;
- ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইসলাম শিক্ষা, ফরয, শিক্ষক।

ইসলাম শিক্ষা কী

ইসলাম শিক্ষা মানে ইসলাম সম্পর্কিত শিক্ষা। ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তেমনি ইসলামি শিক্ষাও একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পদ্ধতি। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে বর্ণিত হয়নি। ইসলাম শিক্ষা এমনই একটি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দান করে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বিশ্বজগত সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনায় একজন মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী, অতুলনিয় সত্তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম শিক্ষাকে তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাও বলা হয়। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে একজন শিক্ষার্থীর মন, মেজাজ, চরিত্র এমন ভাবে গড়ে উঠে যাতে কুরআন-সুন্নাহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ইসলাম শিক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে- "যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে।" এক কথায় বলা যায়, ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হলো ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব

কোনো কাজ করার পূর্বে উক্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ইসলাম মানুষকে তার আত্ম পরিচয়, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে, যোগ্যতা অর্জনে, দায়িত্ব কর্তব্য পালনে, অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা ও গুণাবলি বিকাশে দিকনির্দেশনা দেয়। মানুষের আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু বিধি-ব্যবস্থা জেনে তা বাস্তবায়ন করে উন্নতি, অগ্রগতি, স্থিতিশিলতা ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করে।

ইসলাম শিক্ষা অর্জন করা ফরয। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (ইবনু মাজাহ)

ইসলাম শিক্ষা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাসূল (স) বলেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

"যে ব্যক্তি বিদ্যার্জনের পথ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতাগণ বিদ্যা অর্জনকারির জন্য পথে পাখা বিছিয়ে দেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, বিদ্যা অর্জনকারি নবি-রাসূলগণের উত্তরাধিকারি।

ইসলাম শিক্ষা একটি মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে এ শিক্ষায় পাণ্ডিত্য দান করেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ يُرِيْدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (সহিহ বুখারি)

এ শিক্ষার মহান শিক্ষক হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি বলেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (ইবনু মাজাহ)

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বোঝা। কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ ইসলাম তা নির্দেশ করেছে। তাই ইসলাম শিক্ষা ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এজন্য ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম শিক্ষা হলো ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা। এ শিক্ষা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করা যায়। এ শিক্ষা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ যেমন সৃষ্টিকুলের কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত করে, তেমনি সৃষ্টিকূলও এ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে। এ শিক্ষার মহান শিক্ষক হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাই সকল মানুষের জন্য এ শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ "ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব" সংক্রান্ত পাঠটি বার বার অধ্যয়ন করবেন। ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদিসগুলো অর্থসহ মুখস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলাম শিক্ষার অর্থ হলো-
   ক. ইসলাম সম্পর্কিত শিক্ষা খ. তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা
   গ. কুরআন সুন্নাহ শিক্ষা করা ঘ. 'ক' 'খ' ও 'গ' নং উত্তর সঠিক।

২. ইলিয়াস সাহেব ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, কারণ-
   ক. তিনি বস্তুবাদী মতবাদে বিশ্বাস করতে চান না
   খ. তিনি বিলাসী জীবন যাপন করতে চান
   গ. তিনি ইসলামি মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে জীবন পরিচালনা করতে চান
   ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

৩. পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন-
   ক. মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)
   খ. হযরত আদম (আ)
   গ. মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)
   ঘ. হযরত দাউদ (আ)

উত্তরমালা: ১.ঘ ২.গ ৩. ক

পাঠ-৪ : ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমানের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইমানের মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ইমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা দিতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইলাহ, বান্দা, মৌখিক স্বীকৃতি, আমল, মুমিনে কামিল, মুমিনে নাকিস, মুমিনে ফাসিক, তাওবা।

ইমানের পরিচয়

ইমান (اَلْاِيْمَانُ) শব্দটি আরবি। এটা আমনুন (اَمْنٌ) শব্দ থেকে গঠিত। ইমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, আনুগত্য করা, কারও প্রতি আস্থা পোষণ করে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া।

আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা এবং মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ইমানের পরিচয়ে বলেছেন– "ইমান হচ্ছে ১. আল্লাহ ২. তাঁর ফেরেশতাগণ ৩. তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহ ৪. তাঁর প্রেরিত নবি ও রাসূলগণ ৫. পরকাল (৬) ভাগ্যের ভালো-মন্দে (ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়) এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইমানের পরিচয় দিতে গিয়ে ইসলামি পণ্ডিতগণ যা বলেছেন-

- ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, শুধু মনেপ্রাণে বিশ্বাসের নামই ইমান। মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের জন্য শর্ত। আর বিশ্বাস অনুযায়ী আমল ইমানের পরিপূর্ণতা দান করে।
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং রাসূল (স) কর্তৃক আনীত জীবন বিধানকে কার্যে পরিণত করার নাম ইমান।
- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মতে, সমস্ত আদিষ্ট বিষয়ে আমল করা এবং সকল নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করার নামই ইমান।

- ইমাম গাযালি এবং ইবনে হাযার আসকালানির (র)-এর মতে- মহানবি (স) আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব কিছুর উপর বিশ্বাস করাই ইমান।

মোটকথা শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা মৌলিক ইমান। আর শরিয়তের বিধান তার উপর আরোপের জন্য ও বাহ্যিক পরিচয়ের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান একান্ত প্রয়োজন এবং বাস্তব জীবনে তা আমল করা পূর্ণ ইমানের পরিচায়ক। যিনি এরূপ পূর্ণ ইমানের অধিকারি তিনি হলেন পূর্ণ মুমিন বা মুমিনে কামিল।

আর শরিয়তের বিধি-বিধান সামগ্রিক জীবন যাপনে বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি থাকলে তিনি মুমিনে নাকিস বা মুমিনে ফাসিক (গুনাহগার মুমিন) হিসেবে পরিচিত হবেন। আমলে ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন এবং তাওবা করতে হবে। অন্যথায় অপরাধী হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইমানের শাখা-প্রশাখা

ইমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। একজন পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য এগুলোর হিফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। ইমানের প্রথম কথা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচা আবু তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগিরা তখন বলল- হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? তখন আবু তালিব আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকলেন। আবু তালিব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেননি। হাদিসের বর্ণানুযায়ী যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত ইমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। ইমানের নিম্নতম শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।

ভালো কাজের দ্বারা ইমান বৃদ্ধি পায়। আর খারাপ কাজের দ্বারা ইমানের ঘাটতি হয়। পাপ কাজ করার সময় মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাকে সাথে সাথে তাওবা করতে হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি ইমান অবস্থায় সৎকাজ করে, তবে তার ইমানের জ্যোতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে সবসময় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, জুলম নির্যাতন প্রভৃতি কাজ ত্যাগ করতে হবে।

ইমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক

ইমান ও ইসলামের মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি আরেকটির পরিপূরক। ইসলাম ইমানেরই বহিঃপ্রকাশ। আর ইমান ইসলামের অন্তর্নিহিত অদৃশ্য রূপ। ইমান হলো ইসলামের মূলভিত্তি। ইমান গাছের মূল ও শেকড়ের মতো। আর ইসলাম হলো গাছের কান্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লবের মতো। ইমান যত শক্তিশালি হবে ইসলামি কর্মকাণ্ডও সে অনুযায়ী উত্তম ও উন্নত হবে। ইমান ছাড়া ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। আবার ইসলাম ছাড়া ইমানের পরিচয় মিলে না। ইমান হলো- আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স) আমাদের অদেখা সত্য সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা ও সর্বতোভাবে কবুল করাকে ইমান বলে। ইমান মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহ জন্মে এবং ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহ যোগায়। অনৈসলামিক কাজের প্রতি ঘৃণা যোগায় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

সারসংক্ষেপ

ইমানের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে- আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবি-রাসূলগণের, আখিরাত, ভাগ্যের ভালো-মন্দ ও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। একজন ইমানদার ব্যক্তির জন্য এগুলো হিফাযত করা অবশ্য কর্তব্য।

ইমান ও ইসলামের মধ্যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি আরেকটির পরিপূরক। ইসলাম ইমানেরই বহিঃপ্রকাশ। আর ইমান ইসলামের অন্তর্নিহিত অদৃশ্যরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের প্রধান বিষয় কয়টি?

ক. পাঁটি　　খ. ৭টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৪টি

২. হাসান সাহেব সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের লোক। মিথ্যা বলেন, মানুষ-এর সাথে প্রতারণা করেন এবং তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন না- এতে তিনি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?

ক. তাঁর ইমানের ঘাটতি হবে।

খ. তিনি শেষ বিচারের দিন দোষি সাব্যস্ত হবেন।

গ. তিনি জাহান্নামে যাবেন না।

ঘ. উপরের সকল উত্তর সঠিক।

৩. রফিক সাহেব রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেললেন- এতে তিনি কোন পর্যায়ের কাজটি করলেন?

ক. ইমানের নিম্নতম পর্যায়ের　　খ. পূর্ণ ইমানদারের

গ. মানবতাবোধের　　ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের।

উত্তরমালা: ১.খ　　২. খ　　৩.ক

পাঠ-৫ : ইমানের ৭টি মূল বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমানের ৭টি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফেরেশতাদের প্রতি কীভাবে ইমান আনতে হবে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আল্লাহর কিতাবের প্রতি ইমান কেমন হবে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নবি-রাসূলগণের প্রতি ইমানের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- আখিরাতের প্রতি ইমানের গুরুত্ব সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- তাকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত ও তাকদীর।

মু'মিন হওয়ার জন্য ইমানের ৭টি মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী আমল করা ব্যতিত কখনো কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইমানদার

হতে পারে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন, মুখে স্বীকার করবেন এবং কর্মে পরিণত করবেন তাকেই মু'মিন বলা হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ইমানের মৌলিক ৭টি বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

"রাসূল ও মু'মিনগণ বিশ্বাস রাখেন সে সব বিষয়, যা তার রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং কিতাবসমূহের প্রতি।" (সুরা বাকারা ২:২৮৫)

হযরত জিবরাঈল (আ) যখন রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন, হে মুহাম্মদ (স.) আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন–

اَلْإِيمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"ইমান হলো, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি। পরকালের প্রতি এবং তাকদিরের ভাল ও মন্দের প্রতি।" (মুসলিম)

ইমানের ৭টি বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো–

১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনার অর্থ– তাঁকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, আইনদাতাও বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা। ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য এই বিশ্বাস স্থাপন করা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার যে সুন্দর ও গুণবাচক নামসমূহ রয়েছে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই। তাঁর সমতুল্য কেউ নাই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, এই কথাগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সুরা আযযুখরুফ ৪৩:৮৭)

২. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

ফেরেশতাদের প্রতি ইমানের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি এবং নূরের তৈরি। তাঁরা সকলেই আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে কোন ত্রুটি করে না। রাত দিন তাঁরা আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন থাকে। প্রসিদ্ধ কয়েকজন ফেরেশতা হলেন- হযরত জিবরাঈল (আ), হযরত মিকাইল (আ), হযরত আযরাঈল (আ) এবং হযরত ইসরাফিল (আ)। আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতে ফেরেশতাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরা তা সঠিকভাবে পালন করেন।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলগণের প্রতি যে সব কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা যে, এ কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়ালার বাণী। এ কিতাবসমূহে তিনি মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের পথ বলে দিয়েছেন। তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। হিদায়াতের কথা বলেছেন।

৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি ইমান

নবি-রাসূলগণের প্রতি ইমান আনার অর্থ হচ্ছে, নবি-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে তাঁরা সবাই সত্যবাদী। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সত্যায়িত, আল্লাহভীরু, আমানতদার। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরা তা নিজ নিজ জাতির কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। এর থেকে তাঁরা বিন্দুমাত্র গোপন করেননি কিংবা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি।
আরও বিশ্বাস করা যে, নবি-রাসূলগণ সকলেই সত্যের উপর অটল ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। তাঁর শরিয়ত অনুসারে আমল করা। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব এবং নবি-রাসুলের আগমন ঘটবেনা এই বিশ্বাস করা। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটবে তাদের সকলকেই এই শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে-এ বিশ্বাস পোষণ করা।

৫. আখিরাতের প্রতি ইমান

আখিরাতের প্রতি ইমানের অর্থ হচ্ছে- পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, আখিরাত বা পরকাল নামে আরেকটি অনন্ত জীবন রয়েছে। মৃত্যুর পর কবরের জীবন, আযাব ও শান্তি, সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় ফুঁৎকারে পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে হাযির হওয়া। আমলনামা প্রকাশ হওয়া। দাড়িপাল্লায় পাপ-পুণ্যের ওজন করা। পুলসিরাত ও হাউজে কাওসার। নবি (স.)-এর সুপারিশ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম প্রভৃতির উপর ইমান আনা। আল্লাহ তায়ালা সে দিন কারও প্রতি অবিচার করেবন না এ কথা বিশ্বাস করা।

৬. তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের প্রতি ইমানের অর্থ হচ্ছে- মহান আল্লাহ বান্দার ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করেন-এর উপর বিশ্বাস করা। মানুষের ভাগ্যে যা কিছু ঘটে, যা কিছু হয় তার সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। কোন কিছুই তার ইচ্ছা ছাড়া হয় না। পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ অনুযায়ী ঘটে থাকে।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনার অর্থ হচ্ছে, এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আবার মানুষকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। সেখানে তাদের পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালার কাছে সকল ক্ষমতা থাকবে। যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সারসংক্ষেপ

ইমানের ৭টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখবেন, মুখে স্বীকার করবেন এবং কর্মে পরিণত করবেন তিনি প্রকৃত মুমিন। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইমানের এ মৌলিক বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহতে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতিবিশ্বাস, আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাত জীবনের প্রতি বিশ্বাস-তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে বিচারের জন্য উত্থান ও বিচার শেষে জান্নাত ও জাহান্নামে যেতে হবে তার প্রতি ইমান।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীগণ কয়েকটি গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে ইমানের ৭টি বিষয় সম্পর্কে পরস্পরের সাথে আলোচনা করে তা লিখিতভাবে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের মূল বিষয়গুলোর প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমলকারিকে বলা হবে–
   ক. পরিপূর্ণ মুমিন খ. অপূর্ণ মুমিন
   গ. আংশিক মুমিন ঘ. কপট মুমিন

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বহন করে নবি-রাসূলগণের নিকট নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন কোন ফেরেশতা?
   ক. হযরত মিকাঈল (আ) খ. হযরত জীবরাঈল (আ)
   গ. হযরত ইসরাফিল (আ) ঘ. হযরত আযরাঈল (আ)

৩. তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়-
   ক. হযরত দাউদ (আ)-এর উপর খ. হযরত নূহ (আ)-এর উপর
   গ. হযরত মূসা (আ)-এর উপর ঘ. হযরত ঈসা (আ)-এর উপর

৪. আতাউর রহমান সাহেব বিশ্বাস করেন সকল নবি-রাসূল আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও রাসূল। তাঁরা সত্যবাদী, আল্লাহ ভীরু, আমানতদার এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন- তার এ বিশ্বাসকে বলা হবে-
ক. নবি-রাসূলগণের প্রতি ইমান আনয়নকারি খ. হযরত মূসা (আ)-এর উপর ইমান আনয়নকারি।
গ. আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনয়নকারি ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসি।

উত্তরমালা : ১.ক ২.খ ৩.গ ৪.ক

পাঠ-৬ : আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল্লাহ তায়ালার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- আল্লাহ তায়ালা এ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তা বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের পরিধি উল্লেখ করতে পারবেন।
- আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ প্রমাণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আহাদ, সামাদ, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা।

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ (اللّٰه) শব্দটি আল্লাহ তায়ালার সত্তাবাচক নাম। তিনি অনাদি অনন্ত। তাঁর কোন অংশিদার নাই। তিনি তাঁর সত্তায়, গুণে, কর্মে, মর্যাদায়, ক্ষমতায় এক ও অতুলনীয়।

সুরা ইখলাসে আল্লাহ তাঁর পরিচয় বর্ণনা করে বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বলুন, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।" (সুরা ইখলাস ১১২:১-৪)

তিনি সব সময় আছেন এবং থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, শুনেন এবং দেখেন। সব কিছুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তায়ালার প্রতিদ্বন্দ্বি বা সহযোগি কেউ নেই। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে 'কুন' (كُنْ) বা হয়ে যাও বললে সাথে সাথে (فَيَكُوْنُ) তা হয়ে যায়। তিনি সকল প্রাণিকে (রিযিক) খাদ্য দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার অদৃশ্যের খবর রাখেন। গায়েবের সব চাবি-কাঠি তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। সাগর-মহাসাগরের তলদেশ থেকে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় একটি বালুকণা এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না।

আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবসের জ্ঞান রয়েছে। কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। মায়ের গর্ভে কি লালিত-পালিত হচ্ছে তা তিনিই জানেন। তিনি ছাড়া কেউ জানে না আগামীকাল একজন সে কী কামাই করবে। কেউ জানেনা কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই সব কিছু জানেন এবং সর্ব বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশংসার পরিমাণের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

"বল, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে- আমরা এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও। " (সুরা আল-কাহাফ ১৮: ১০৯)

সুরা লুকমানে বর্ণিত হয়েছে যে, "পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্র কালি হয়। তার সাথে আরও সাতসমুদ্র যুক্ত হয়। তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা লুকমান ৩১:২৭)

তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে অংশিদার স্থির করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালার রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলিতে এক এবং একক। এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁর অংশিদার হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি গুণ অন্যগুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আল্লাহর গুণাবলিও তাঁর মূল সত্তার সাথে নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রমাণ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি একাধারে পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা এবং ক্ষমতাবান। তিনি একাই এ বিশ্বজগত পরিচালনা করেন। তাঁর এ পরিচালনায় তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার ইচ্ছামত সৃষ্টি ও মৃত্যুদান করেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাঁরই নির্দেশ মেনে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। এতে কোথাও কোন রকম বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এ বিশ্ব পরিচালনায় যদি তাঁর কোন শরীক থাকতো তা হলে বিশ্বের এ চিরস্থায়ী নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়তো। কারণ, একজনের নিয়ম নীতি ও পরিচালনা অন্যজনের কাছে পছন্দ হতো না। একজন কোন কিছু করতে চাইলে অন্যজন অন্যভাবে পরিচালনা করতো। কিন্তু আমরা এ বিশ্বের পরিচালনায় কোন অনিয়ম দেখতে পাচ্ছি না। সব কিছুই একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়- আল্লাহ তায়ালা এক, একক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

"যদি আসমান ও যমিনে আল্লাহ ছাড়া একাধিক প্রভু থাকতো, তাহলে অবশ্যই তা ধ্বংস হয়ে যেত।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২২)

আল্লাহ তায়ালা যে ভাবে তাঁর পরিচয় আমাদেরকে জানিয়েছেন, সেভাবেই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। কমবেশি বা বাড়াবাড়ি কোন কিছুই করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ শব্দটি তাঁর আল্লাহ তায়ালার সত্তাবাচক নাম। তিনি অনাদি, অনন্ত। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও একক। তাঁর কোন অংশিদার নেই।

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা জন্য নির্ধারিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানময়। আল্লাহ গায়েবের খবর রাখেন। জল ও স্থলভাগে যা কিছু আছে তা তাঁর জ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবসের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই জানেন, মায়ের গর্ভে কী লালিত পালিত হচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। আল্লাহ তায়ালার রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। এ নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা, আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম শিখবেন এবং তা শিক্ষককে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও একক- এ কথায় বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে-
   ক. ইসলাম খ. ইমান
   গ. ইহসান ঘ. তাকওয়া

২. আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামের সংখ্যা-
   ক. ১০০টি খ. ৯৯টি
   গ. ৯০টি ঘ. ১০১ টি

৩. কামাল সাহেব আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করেন না। বরং তিনি একাধিক খোদায় বিশ্বাসী। এতে তাঁর পরিচয় কী হবে?
   ক. মুশরিক খ. কাফির
   গ. মুনাফিক ঘ. পৌত্তলিক

পাঠ-৭ : কুফর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুফর-এর অর্থ বলতে পারবেন।
- কুফরের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুফরি কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- কুফরের পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	কুফর, গায়েব, হাশর, আহকাম, তাগুত, হালাল, হারাম।

কুফর-এর পরিচয়

কুফর (كفر)-এর অর্থ- গোপন করা, ঢেকে রাখা, অস্বীকার করা ও অকৃতজ্ঞ হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে মহানবি (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা অকাট্যভাবে দীনের অঙ্গ হিসেবে পরিচিত, এ সবের কোন একটি অস্বীকার করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরি কাজে লিপ্ত তাকে (كَافِرٌ) কাফির বলে। কুফর ইমান ও ইসলামের পরিপন্থি।

কুফর হচ্ছে এক ধরনের অজ্ঞতা। কুফর সবচেয়ে বড় জুলুম এবং মারাত্মক পাপ। সকল অনাচারের মূলে কুফরি। সুতরাং কুফর থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, তাকদির, কিয়ামত, আখিরাত, হাশর, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম এগুলোকে অস্বীকার করা কুফরি। ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকাম অস্বীকার করা কুফরি কাজ। তাছাড়া কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন কিছু অস্বীকার করা বা আংশিক অস্বীকার করাও কুফরি।

কুফরি কথা ও কাজ-

১. ইমানের ৭টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস না করা কুফরি কাজ।

২. আল্লাহ বা নবি-রাসূলকে গালি দেওয়া, নবি-রাসূল দোষ-ত্রুটি খোঁজে বের করার চেষ্টা করা, তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি।

৩. ফেরেশতাদেরকে গালি-গালাজ করা বা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

৪. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি অস্বীকার করা। অর্থাৎ খতমে নুবুওয়াতকে অস্বীকার করা।

৫. আল-কুরআনকে সর্বশেষ আসমানি কিতাব হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা এবং মানব রচিত গ্রন্থ বলে মনে করা।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা।

৭. হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল জানা।

৮. কোন হারাম বস্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা।

৯. পবিত্র কুরআনের আয়াত অস্বীকার করা বা এর কোন নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

১০. ইসলামের মৌলিক ইবাদত যেমন সালাত, যাকাত, সাওম এবং হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতকে অস্বীকার করা।

১১. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

কুফরির পরিণতি

এ ছাড়াও আরও অনেক কুফরি কথা ও কাজ রয়েছে। কাজেই কেউ এ সকল কুফরি কাজ করলে কিংবা কুফরি কথা বললে মানুষ কাফির হয়ে যায়। কুফরির কারণে একজন মানুষ পরকালে জাহান্নামি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"আর যারা কুফরি করে তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা জাহান্নামি সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সুরা আল-বাকারা ২:২৫৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

"যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শন মিথ্যা জ্ঞান করে তারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।" (সুরা আল-মায়িদা ৫:১০)

কুফরি মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়। কুফর মানুষের মাঝে অবাধ্যতার জন্ম দেয়। কুফরির কারণে সহজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়। কাফিররা আল্লাহ তায়ালার বিধানকে অস্বীকার করে, নিজেদের নফসের অনুসরণ করে। তাই তারা নানা রকম অশ্লীল ও অসৎ কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। এতে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে। পাপাচারে সমাজ ভারাক্রান্ত হয়।

কাফিরদের অন্তরে সর্বদা হতাশা বিরাজ করে। তারা বিপদে আপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। তারা সব সময় অনৈতিক কাজ করে। তারা আখিরতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ফলে তাদের নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না।

অতএব সকলকে কুফরি কাজ ও কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিষ্কলুষ রাখতে হবে।

সারসংক্ষেপ

কুফর অর্থ হচ্ছে- সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ও অবিশ্বাস করা। অনুরূপভাবে মহানবি (স) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা অকাট্যভাবে দীনের অঙ্গ বলে প্রমাণিত, এ সবের কোন একটিকে অস্বীকার করার নাম কুফর।

ইমানের ৭টি বিষয়কে অস্বীকার করলে কুফরি করা হয় এবং ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়।

আল-কুরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করা এবং সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার না করা কুফরি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা, হালালকে হারাম জানা এবং হারামকে হালাল জানা কুফরি। পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা কুফরি। ইসলামের মৌলিক ইবাদত অস্বীকার করা এবং এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফরি। কুফর মানুষকে বিবেকহীন করে দেয়। কুফরির কারণে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়। অতএব কুফর ও কুফরি কাজ কর্ম থেকে সকলে বিরত থাকা অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি	শিক্ষার্থীগণ কুফরি কাজের একটি তালিকা তৈরি করে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ছুটির দিনে সমাবেশের আয়োজন করে তা উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
ক. অবিশ্বাস করা
খ. অস্বীকার করা
গ. ঢেকে রাখা
ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

২. ফাহাদ এক আলোচনায় তার বন্ধুদের বলল- আল্লাহ নেই। এর ফলে সে কী হবে?
(i) ফাসিক
(ii) কাফির
(iii) অবিশ্বাসি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. সগির সাহেব কুফরি কর্মকান্ডে লিপ্ত! ফলে পরকালে তার পরিণাম হবে-
(i) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
(ii) জাহান্নাম
(iii) হাবিয়া।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. সালামত সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করেন। আবার ঘুষ খাওয়াকে হালাল মনে করেন। বাস্তবে সালাত আদায়েকারি হলেও ঘুষ খাওয়াকে হালাল মনে করায় তাকে কি বলা যাবে?
ক. পাপাচারি
খ. কাফির
গ. ফাসিক
ঘ. মিথ্যাচারি।

পাঠ-৮ : তাওহীদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- তাওহীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলতে পারবেন।
- তাওহীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- তাওহীদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তাওহীদের সুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	তাওহীদ, রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়াতে, ইবাদত।

তাওহীদ-এর পরিচয়

তাওহীদ (تَوْحِيْد) শব্দের আভিধানিক অর্থ- কোন জিনিসকে এক ও একক বলে স্বীকার করা, কোন সত্তাকে এক বা একক বলে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রচলিত অর্থে তাওহীদ শব্দের অর্থ- আল্লাহর একত্ববাদ। এটা ইসলামি আকিদার মূল ভিত্তি।

আল্লাহ তায়ালাকে ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহীদ বলে।

এ কথাও স্বীকার করা যে তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, মালিক ও প্রভু। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে যেমন একক, তেমনি তিনি তাঁর কর্মে, মর্যাদায় একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং যে ভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি পরিচালনা করেন। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারি এবং সমস্ত জ্ঞান, শক্তি ও কল্যাণের উৎস।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিধান মেনে চলা, অন্য কারও আনুগত্য বা ইবাদত না করা বা কাউকে তাঁর অংশিদার মেনে না নেওয়ার বিশ্বাসই হলো তাওহীদ।

তাওহীদকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা–

১. রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ : এ প্রকার তাওহীদের অর্থ হলো- আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং সব সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারি। তিনি একাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্ট জীবের রিযিক দান করে থাকেন। তিনি অফুরন্ত নিয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর সার্বভৌমত্বে কারও অংশিদারিত্ব নেই।

২. উলুহিয়াতের তাওহীদ : এর অর্থ হচ্ছে– প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় দাসত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ ছাড়া কারও উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা যাবে না, অন্য কারও উদ্দেশ্যে যবাই করা যাবে না। অন্য কারও নামে মানত করা যাবে না, অন্য কারও উদ্দেশ্যে হজ্জ-উমরা করা যাবে না। অন্য কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা যাবে না। সবকিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে- এ বিশ্বাস রাখা।

৩. আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণসমূহের তাওহীদ : আল্লাহ তায়ালার সে সব নাম ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যা তিনি তাঁর কিতাবে নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন। কিংবা তাঁর রাসুল আল্লাহ তায়ালার জন্য যে সব নাম ও গুণাবলি বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালার জন্য রয়েছে উত্তম গুণগত নাম। সে সব নাম ধরেই তাকে ডাকতে হবে।

তাওহীদের গুরুত্ব

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। ইসলাম বা ইমানের মূল কথা হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। একজন মানুষ মুমিন বা মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করতে হয়। তাওহীদে বিশ্বাস ব্যতিত কোন মানুষ ইমানদার হতে পারে না। হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবি-রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা ছিল এ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এ কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নবি-রাসূলগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন।

তাওহীদের সুফল

তাওহীদের অনেক সুফল রয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো:

১. তাওহীদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। তাওহীদে বলিয়ান একজন মানুষ কারও কাছে মাথা নত করে না। ফলে তার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

২. তাওহীদে বিশ্বাসি একজন মুমিন পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করে।

৩. তাওহীদে বিশ্বাসি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং মুহাম্মদ (স)-এর সুপারিশ অর্জনকারি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

৪. তাওহীদে বিশ্বাসি মানুষের ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার উপযোগী হয়।

৫. তাওহীদে বিশ্বাসি বান্দার সর্ব প্রকার পাপ কাজ পরিত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়।

৬. তাওহীদে বিশ্বাসি ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবেন।

৭. তাওহীদে বিশ্বাস করলে দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট, বিপদ আপদে ধৈর্য্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সহজ হয়ে যায়।

৮. তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে মানুষের গোলাম থেকে বান্দা নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে।

৯. যখন তাওহীদ অন্তরে পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। তখন বান্দার অল্প আমল আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও অধিক সওয়াবে পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপ

তাওহীদ ইসলামি বিশ্বাসের মূলভিত্তি। তাওহীদ হলো- আল্লাহর একত্ববাদ। মহান আল্লাহ তায়ালাকে ইবাদতের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে মেনে নেওয়াকে তাওহীদ বলে। তিনি তাঁর সত্তায় যেমন একক তেমনি তিনি তাঁর কর্মে ও মর্যাদায় একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদা দান করে। তাওহীদে বিশ্বাসি ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করে। তাওহীদে বিশ্বাসি মানুষের ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয়। তাওহীদে বিশ্বাসি ব্যক্তি চিরস্থায়ি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন। তাওহীদে বিশ্বাসি ব্যক্তির স্বল্প আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও অধিক সওয়াব লাভের সুযোগ হয়। আমরা তাওহীদ বিশ্বাসে অটল থাকবো।

অ্যাকটিভিটি / শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ তাওহীদে বিশ্বাসের সুফলগুলো নিজেরা আয়ত্ব করবেন এবং তাওহীদে বিশ্বাসের সুফলের কথা মানুষকে জানাবেন। যাতে সকলে তাওহীদে বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অবিশ্বাসি না থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাওহীদ শব্দের অর্থ হচ্ছে-
ক. অংশিবাদ
খ. একত্ববাদ
গ. বহুত্ববাদ
ঘ. পৌত্তলিকতাবাদ

২. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের নাম-
ক. ইসলাম
খ. ইহসান
গ. তাওহীদ
ঘ. তাকওয়া

৩. রাসেল সাহেব একজন খাঁটি ইমানদার হতে ইচ্ছুক। এজন্য তাকে বিশ্বাসি হতে হবে–
(i) ইসলামে
(ii) তাওহীদে
(iii) রিসালাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. তাওহীদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ উৎসাহিত হয়-
(i) অর্থ উপার্জনে
(ii) সৎকর্মে
(iii) ইবাদত বন্দেগীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১.খ ২.গ ৩. ৪.

পাঠ-৯ : শির্‌ক

উদ্দেশ্যে

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- শিরকের পরিচয় দিতে পারবেন।
- শিরকের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিরকের কুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	শিরক, শিরকে আকবার, শিরকে আসগর, যুলুম।

শিরকের পরিচয়

শিরক হলো তাওহীদ এর বিপরিত।

মহা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক বা অংশিদার সাব্যস্ত করার নাম শিরক। এ বিশ্বের একাধিক নিয়ন্ত্রণকারি ও একাধিক বিশ্ব স্রষ্টা রয়েছেন বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালার জন্য ইবাদত নির্দিষ্ট না করে আরো একাধিক ইলাহের নামে ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি কোন সৃষ্ট বস্তুকে তাঁর সমতুল্য, সমগুণ সম্পন্ন ও সমশক্তি সম্পন্ন ধারণা করা বা বিশ্বাস করা হলো শিরক। আবার যে সকল ইবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, সে সব ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে স্থান দান করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক।

যদি কেউ আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অথবা কাউকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য মনে করে তার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে, তবে তা শিরকে পরিণত হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা এবং তাদের নিকট থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা শিরক। বিপদ-আপদে অন্য কারও নিকট সাহায্য চাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোনো মৃত ব্যক্তি, অলি আল্লাহ, পীর, মোরশিদ ও বুজুর্গের মৃত্যুর পর এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তারা কবরের মধ্যে থেকে অলৌকিকভাবে মানুষের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে পারে। সাহায্য করতে পারে উন্নতি দিতে পারে ও ভালমন্দ সব কিছু করতে পারে। এরূপ বিশ্বাস নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা। জীব-জন্তু জবাই করা। তাদের কবরের উপর সিজদা করা, নিজেদের সম্পদের একটা অংশ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার প্রয়োজন মনে করা এসব কাজই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

শিরক দুই প্রকার। যথা–

(১) শিরকে আকবার (বড় শিরক)।

শিরকে আকবার বা বড় শিরক হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করা। যেমন ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র ও বিবি মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করা। আল্লাহকে ডাকার মতো অন্য কাউকে ডাকা, আল্লাহর কাছে যা চাওয়া যায়, তা অন্য কারও কাছে চাওয়া। আল্লাহর গুণাবলিতে অন্য কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা সাব্যস্ত করা। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা প্রভৃতি কাজ শিরকে আকবার।

(২) শিরকে আসগার (ছোট শিরক)

যে সকল কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়, সে সকল কথা ও কাজই শিরকে আসগার বা ছোট শিরক হিসেবে গণ্য। যেমন ইবাদতের প্রতি একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট না হয়ে লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা শিরকে আসগার। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নামে কসম খাওয়া এমন কথা বলা যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আপনার ইচ্ছায় আমি ভালো আছি। অথবা এরূপ বলা যে, আল্লাহ এবং আপনি আমার জন্য যথেষ্ট। লোক দেখানো কাজ শিরকে আসগারের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না। যেমন- মুনাফিকের নামায।

মহানবি (স) বলেন, আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে, শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। তাঁকে ছোট শিরক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখানো আমল।

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক মানুষের অজান্তেই হয়ে যায়। হাদিস শরীফে আছে- রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সিয়াম সাধনা করলো সে শিরক করলো এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করলো সে শিরক করলো (মুসনাদে আহমদ)।

শিরকে আসগার কখনো কখনো অবস্থা ভেদে বক্তার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শিরকে আকবারে পরিণত হয়। তাই, শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার এই উভয় প্রকার শিরক থেকে আমাদের বেঁচে থাকা অবশ্য কর্তব্য।

শিরকের কুফল ও পরিণাম

শিরক জঘণ্যতম অপরাধ। শিরক কুফরির মতোই ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

"নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।" (সুরা লুকমান ৩১:১৩)

শিরক করা অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" (সুরা আন-নিসা, ৪:৪৮)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সব সত্তাকে ডাকে বা দোয়া করে, যারা তার ডাকে কিয়ামত পর্যন্তও সাড়া দিতে পারবে না। যারা এরূপ কাজ করে অর্থাৎ শিরক করে তারা পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

"আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকেও ডাকবে না, যারা তোমার উপকারও করতে পারে না, অপকার ও করতে পারবে না, কারণ এটা করলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সুরা ইউনুস ১০:১০৬)

আল্লাহর সাথে শিরককারি ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহিহ বুখারী)

শিরকের কারণেই সমাজে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লেগে আছে। মানুষ যদি শিরক না করত তাহলে একত্ববাদি হিসেবে সকল মানুষ একই ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে বসবাস করত। কিন্তু শিরক করার কারণে অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে ইলাহ হিসেবে

গ্রহণ করার কারণে মানুষ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। অথচ তারা জানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ইলাহ নেই। তারপরেও তারা শিরক করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে।

শিরক থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক ইমান আকিদাহ পোষণ করে আমাদেরকে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

শিরক তাওহীদ-এর বিপরিত। শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক করা বা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করা এবং বিশ্বপরিচালনায় একাধিক নিয়ন্ত্রণকারি ও একাধিক বিশ্ব স্রষ্টা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। এমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করা, বিপদ-আপদে অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক।

শিরক দুই প্রকার। যথা- শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার। আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আপনার ইচ্ছায় আমি ভাল আছি।

শিরক করা জঘন্যতম অপরাধ। শিরক কুফরির মতই ঘৃণ্য কাজ। শিরক করা আল্লাহর উপর জুলম করার নামান্তর।

আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করলে ও শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহর সাথে শিরককারি ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই, শিরক করা থেকে প্রত্যেকটি মানুষকে বেঁচে থাকা আবশ্য কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিরক শব্দের অর্থ-
   ক. আল্লাহকে অস্বীকার করা, খ. আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া
   গ. আল্লাহর প্রশংসা না করা ঘ. আল্লাহর সাথে অংশিদার সাব্যস্ত করা।

২. ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা কোন ধরনের শিরক?
   ক. শিরকে আকবার খ. শিরকে আসগার
   গ. আল্লাহর গুণাবলিতে শিরক ঘ. মূর্তি পুজার শিরক

৩. জাফর সাহেব মাজারে সিজদা করেন? তার এরূপ সিজদা কার কাজ?
   ক. ফাসিকের খ. কাফিরের
   গ. মুশরিকের ঘ. মুনাফিকের

৪. আফজাল সাহেবের কোনো সন্তান নেই। তিনি মাজারে গিয়ে সন্তান কামনা করেন। তার এরূপ কাজের পরিণতি হচ্ছে-
   (i) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (ii) ভয়াবহ শাস্তি
   (iii) জাহান্নামের অগ্নিকুন্ড
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০ : নিফাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নিফাকের পরিচয় ও অর্থ বলতে পারবেন।
- নিফাক-এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন মুমিনের মাঝে যদি নিফাকের লক্ষণ পাওয়া যায় তবে শরিয়াত অনুযায়ী তার বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নিফাক-এর কুফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নিফাক থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকার কী তা বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	নিফাক, মিথ্যা, ওয়াদা, আমানত, খিয়ানত, জাহান্নামের নিম্নস্তর।

নিফাক-এর পরিচয়

নিফাক (نفاق) এর অর্থ হচ্ছে- কপটতা, প্রতারণা, ভণ্ডামী, ধোঁকাবাজি ও দ্বিমুখী ভাব পোষণ করা। যারা এরূপ করে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মুনাফিক ঐসব লোককে বলা হয়, যারা মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বলে কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করে। মুখে ইমানের কথা বলে অন্তরে কুফরি গোপন রাখে। মুনাফিকের লক্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حدَّث كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোন কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন খিয়ানত করে।" (সহিহ বুখারি)

মুনাফিক ২ শ্রেণিতে বিভক্ত। (১) আকিদা ও বিশ্বাসগত মুনাফিক, (২) আমলগত বা কর্মের দিক থেকে মুনাফিক।

আকিদাগত মুনাফিক- যারা মুখে ইসলামের কথা বলে প্রকাশ করে। অন্তরে কুফরি গোপন রাখে। অর্থাৎ যাদের অন্তরের বিশ্বাস আর মুখের স্বীকৃতি এক নয়। একটি অপরটির বিপরিত। লোক দেখানোর জন্য তারা ইসলামি অনুষ্ঠানাদি পালন করে আর অন্তরে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে এরা খুবই ভয়ানক। এ ধরনের নিফাক জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ। এ রূপ নিফাক কুফরি থেকেও মারাত্মক। এ জাতীয় মুনাফিকরা রাসূল (স) এবং মুসলিমদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তারা গুপ্তচরবৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মহানবি (স) মুসলিমদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

"আর মানুষের মাঝে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনেছি। আসলে তারা মুমিন নয়।" (সুরা আল-বাকারা ২:৮)

এ জাতীয় মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

"আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।" (সুরা আল-বাকারা ২:১৪)

দ্বিতীয় প্রকারের নিফাক আমলগত বা কর্মের দিক থেকে মুনাফিক। এ প্রকার মুনাফিকরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করে প্রকৃত মুমিন হতে চায়। কিন্তু দুনিয়ার মোহে পড়ে তারা এ উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকে। তাদের ইমান থাকলেও তারা আমলে বা ইবাদতে গাফেলতি করে। যে নিফাক আমল বা কর্মের দিক থেকে সংঘটিত হয়, তাকে নিফাকে আসগার বা ছোট নিফাক বলে। এ জাতিয় নিফাককারি বা মুনাফিকরা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয় না। কিন্তু তারা এমন আচার-আচরণ বা পথ অবলম্বন করে যা তাদেরকে নিফাকে আকবার বা বড় নিফাকে পৌছে দেয়। ফলে তাদের দ্বারা পাপকার্য হতে থাকে।

এ ধরনের মুনাফিককে তাওবা করে সংশোধন হতে হবে।

নিফাকের কুফল ও প্রতিকার

আকিদার ক্ষেত্রে নিফাক একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নিফাককারিদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। এ জাতীয় নিফাককারি বা মুনাফিকরা পরকালে কাফিরদের সাথে এক ও অভিন্ন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا

"নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করবেন।" (সুরা আন-নিসা ৪:১৪০)

এ জাতীয় মুনাফিকেরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। আল্লহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতমস্তরে থাকবে।" (সুরা আন-নিসা ৪:১৪৫)

আল্লাহ মুনাফিকদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। মৃত্যু হলে তাদের জানাযার নামায পড়তে এবং তাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেও নিষেধ করেছেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান গ্রহণ না করে নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

মুনাফিকের কোন চরিত্র নেই। স্বার্থের খাতিরে লোভ-লালসার বশবর্তি হয়ে তারা সব ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে পারে। তারা পরনিন্দা ও গীবত করে। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। নিফাকের কারণে তারা সমাজের মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি ও খুন-খাবাবির মতো জঘন্য কাজে মানুষকে উৎসাহিত করে। তারা ইসলামের আবির্ভাব কাল থেকে মুসলমানদের চিহ্নিত শত্রু।

নিফাকী কাজ-কর্ম থেকে প্রতিটি মানুষকে দুরে থাকতে হবে। আকীদা ও কর্মে নিফাক হয় এমন সকল চিন্তা, ভাবনা ও কাজ-কর্ম পরিহার করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

সারসংক্ষেপ

নিফাক একটি অতি ঘৃণ্য পাপ কাজ। যারা নিফাক করে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। নিকাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে- কপটতা, প্রতারণা, ভান্ডামী, ধোকাবাজী ও দ্বিমুখী নীতি পোষণ করা। অর্থাৎ অন্তরে এক রকম পোষণ করা ও বাইরে অন্য রকম প্রকাশ করা। মুখে ইমানের কথা বলে অন্তরে কুফরি পোষণ করা।

মুনাফিকের আলামত তিনটি : যথা- যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন তা খিয়ানত করে।

মুনাফিকরা গুপ্তচর বৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মহানবি (স) ও নও মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত করত। মুনাফিকরা ২ শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা- আকিদা বা বিশ্বাসগত মুনাফিক এবং আমলগত বা কর্মের দিক থেকে মুনাফিক।

মুনাফিকরা পরকালে কাফিরের ন্যায় শাস্তি ভোগ করবে। প্রতিটি মানুষকে মুনাফিকি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্যেক শিক্ষার্থী মুনাফিকের তিনটি আলামত ভালোভাবে মুখস্ত করবে এবং তার আশপাশের দশজন মুসলমানকে মুনাফিকের তিনটি আলামত বর্ণনা করে তাদেরকে নিফাকি কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিফাক শব্দের অর্থ কী?
ক. অবিশ্বাস খ. অস্বীকার
গ. মিথ্যাচার ঘ. কপটতা

২. মুনাফিকরা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির কেন?
ক. তারা ইসলামকে অস্বীকার করে খ. তারা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে
গ. তারা মুসলমানদের অবিশ্বাস করে ঘ. তারা মুসলমানদের উপহাস করে।

৩. মাতলুব সাহেব একজন শ্রদ্ধভাজন ব্যক্তি। তার নিকট জনৈক ব্যক্তি দুই লক্ষ টাকা আমানত রাখে। প্রয়োজনের সময়ে টাকাগুলো ফেরত চাইলে তিনি তা ফেরত দিতে অস্বিকার করেন। তার এরূপ আচরণ কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. পৌত্তিলিকের খ. ফাসিকের
গ. মুনাফিকের ঘ. কাফিরের

৪. ফারুক সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। যে কারও কাছ থেকে কোন জিনিস ধার নিলে ফেরত দেয় না। তার এরূপ আচরণে ধ্বংস হয়ে যাবে তার-
(i) ধন-সম্পদ (ii) নৈতিকতা ও ইসলামি মূল্যবোধ
(iii) শিক্ষা জীবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ঘ ২. ৩.গ ৪.

পাঠ-১১ : মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে পারবেন।
- মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমান মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে'- ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	মূল্যবোধ, ইমান, চেতনা।

মানবিক মূল্যবোধ

মানবিক মূল্যবোধ এমন একটি গুণ, যা একজন মানুষকে সমাজের উচ্চ স্তরে আসীন করে। মানবিক মূল্যবোধের কারণে মানুষের মাঝে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সৃষ্টি হয়; যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ উপকৃত হয়। যার মাঝে এ সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণের বিকাশ ঘটবে তিনি মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবেন।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে যখন মানুষ ইসলামের প্রতিটি নিয়ম কানুন মেনে চলে, তখন সে সকল প্রকার সংকীর্ণতা থেকে উর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বংশ, গোত্র, জাতি ও সম্প্রদায় এ সব কিছুর চিন্তা বাদ দিয়ে ইমানদার ব্যক্তি তখন গোটা বিশ্বকে নিয়ে চিন্তা করে। আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে একজন ইমানদার নিজের পরিবার মনে করে। ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে একজন মুমিন তখন সৃষ্টির মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত থাকে। ফলে সে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্রোধ, প্রভৃতি পাশবিক চরিত্র বর্জন করার চেষ্টা করে।

ইমানের চাহিদা অনুযায়ি, সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, আমানতের খিয়ানত না করা, মানুষকে প্রতারণা না করা, বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করে আর্ত মানবতার সেবা করা, প্রতিবেশির খোঁজ খবর নেওয়া, ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, বিপদ আপদে পাশে থেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা প্রভৃতি কাজ ইমানি ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে পালন করতে হয়।

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে-

- ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখার কারণে বিপদ-আপদে দৃঢ় মনোবল সাহস নিয়ে এগিয়ে। কখনও হতাশা ব্যক্ত করে না।
- ইমান এক অনবদ্য চেতনার নাম। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, মানুষকে সৎ জীবন পরিচালনায় প্রেরণা যোগায়।
- ইমান মানব চরিত্রকে নম্র ও বিনয়ি করে। যারা প্রকৃত ইমানদার তাঁদের মনের মধ্যে কোন অহংকার বা গর্ববোধ থাকে না। ইমান তাকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে ভাই ভাই হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার উৎসাহ প্রদান করে।
- ইমান মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। একজন মানুষ যখন তার ব্যক্তি-সত্তা, অহংবোধ সব কিছু ত্যাগ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি আর কাউকে ভয় করেন না। সে আল্লাহ ব্যতিত কারও কাছে মাথা নত করে না।

- ইমানদার কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সত্য ও সুন্দরের পথে চলে। সে সব সময় ইসলামের মহান আদর্শের অনুসারি হিসেবে জীবন যাপন করে। সাম্য মৈত্রি, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানবিক মূল্যবোধের চরম বিকাশ লাভ করে।
- ইমান মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। একজন ইমানদার ব্যক্তি অন্ধকার পথ ত্যাগ করে আলোর পথ গ্রহণ করে। ইমানদার ব্যক্তির পক্ষে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ও অসামাজিক কাজ ইত্যাদি করা সম্ভব নয়। এভাবে একজন ইমানদার মানবিক গুণাবলি ও মূল্যবোধে বলিয়ান হয়ে উঠে এবং আদর্শ মানব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।
- ইমান মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সে অনৈতিক ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। সে মনে করে যে, সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায়, অনিয়ম, অপরাধ ও দুষ্কর্ম রোধ করা তাঁর ইমানী দায়িত্ব। মৃত্যুর পর তাঁকে আল্লাহর জবাবদিহিতার সম্মুখিন হতে হবে। পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে একজন মুমিন সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করার ভয় ও আত্মার পূজারি হওয়া থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেই একজন মানুষের মাঝে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে। আর ইমানদার হওয়া ছাড়া এ জাতীয় মানবিক গুণাবলিতে উজ্জিবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ

মানবিক মূল্যবোধ এমন একটি গুণ যা একজন মানুষকে মর্যাদার উচ্চস্তরে সমাসিন করে। মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসি ব্যক্তি সকলের কাছে প্রশংসিত হয়। ইমানদার ব্যক্তিই একমাত্র বংশ, গোত্র, জাতি ও সম্প্রদায় সব কিছুর চিন্তা বাদ দিয়ে গোটা বিশ্বকে নিয়ে কাজ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে একজন ইমানদার ব্যক্তি নিজ পরিবার মনে করে। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্রোধ, মিথ্যা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, প্রতারণা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে।

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমানদার ব্যক্তি ইমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানব কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানবিক মূল্যবোধ একজন ব্যক্তিকে-
   ক. অপমানিত করে — খ. সম্মানিত করে
   গ. দেশান্তর করে — ঘ. পশ্চাৎপদ করে।

২. ইমান মানুষের পাশবিক শক্তিকে-
   ক. বাড়িয়ে দেয় — খ. দমন করে
   গ. নিষ্ক্রিয় করে — ঘ. কোন কিছুই করে না।

৩. সালেহ সাহেব একজন সৎ লোক। তিনি মানবসেবা করেন এবং সত্য কথা বলেন। এর ফলে তিনি সমাজে পরিচিতি লাভ করবেন-
   ক. মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে — খ. চরমপন্থি হিসেবে
   গ. সাম্প্রদায়িক হিসেবে — ঘ. সমাজের বোঝা হিসেবে

৪. পরকালের ভয়ে একজন মুমিন সব ধরনের অসামাজিক আচরণ ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। এর ফলে লাভ করবে-
   (i) জান্নাত — (ii) জাহান্নাম
   (iii) ধন-সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১.খ　　২. খ　　৩. ক　　৪.ক

পাঠ-১২ : নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে আকাইদ-এর শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আকাইদ এর পরিচয় দিতে পারবেন।
- আকাইদ পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আকাইদ এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে আকাইদ এর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আকাইদ, নৈতিক, সৌভাগ্য, সিরাতুল মুস্তাকিম।

আকাঈদ এর পরিচয়

আকাইদ (عَقَائِدُ) আকিদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ-বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ ইত্যাদি।

যে শাস্ত্রে ইমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তি নির্ভর দলিল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল আকাইদ বা আকাইদ শাস্ত্র বলা হয়।

আকাইদ শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে বিশ্বাস করা যায়। ইমানের প্রকৃতি, কোন কোন বিষয়, কীভাবে এবং কতটুকু ইমান জরুরি সে সব বিষয় নিয়ে এ শাস্ত্র সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই এ বিষয়ের জ্ঞানকে সর্বোত্তম জ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

আকাইদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজকে রক্ষা করা। ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলিল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথ ও সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান দান করা।

আকাইদ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

আকাইদ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি এভাবে প্রকাশ করা যে, ঐগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাত সংক্রান্ত বিষয়াবলি আকাইদের মূল বিষয়বস্তু।

ইসলামি আকিদার মূলনীতিসমূহ

ইসলামি আকিদার ছয়টি মূলনীতি রয়েছে। যথা-

১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস: মহান আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা ইসলামি আকিদার মূল স্তম্ভ।

২. ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস: আল্লাহ তায়ালা ও মহানবি (স) ফেরেশতাদের পরিচয় ও কার্যাবলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার উপর বিশ্বাস করা। ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। নূরের তৈরি। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা নন। তারা সব সময় আল্লাহর আদেশ পালন করেন। তাঁরা কোন খাবার গ্রহণ করেন না।

৩. কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন: ইসলামি আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবি রাসূলের মাধ্যমে যুগে যুগে তাঁর বাণী বা বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এসব বাণী সমষ্টিই আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাবের সংখ্যা মোট ১০৪টি। এর মধ্যে ৪টি হলো প্রধান। সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান রাখতে হবে।

৪. রাসূলগণের প্রতি ইমান: ইমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবি ও রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁদের প্রতি এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নবি-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনিত প্রেরিত ব্যক্তি। তাঁরা পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবি-রাসূলের উপর ইমান রাখতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি ইমান: এ বিশ্বাস করা যে, প্রত্যেক মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর পর আবার মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং হাশরের ময়দানে পাপ পুণ্যের ফয়সালার জন্য উঠানো হবে। পাপিরা জাহান্নামে যাবে আর পুণ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৬. তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা: মানুষের ভালো-মন্দ তাকদিরের লিখন অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের মৌলিক বিষয়।

নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে আকাইদের শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা নৈতিক মূল্যবোধের অন্যতম অংশ। সমগ্র বিশ্ব যে, একই স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে আকাইদ মানুষকে সেই শিক্ষা দেয়। আকাইদ মানুষকে বহুত্ববাদ থেকে একত্ববাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, যা মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের অন্যতম উপাদান।

২. আকাইদের শিক্ষা অনুযায়ি সকল মানুষ এক জাতি। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সাদা-কালো, ধনি-দরিদ্র সকলেই আদম সন্তান ও মাটি থেকে তৈরি। আকাইদ পৃথিবীর সকল মানুষকে আদম সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই মানুষে মানুষে পার্থক্য করা নৈতিক মূল্যবোধের বিপরিত কাজ।

৩. একজন মানুষ যখন ইমান গ্রহণ করে তখন জীবন, তার রক্ত ও ধন-সম্পদ হিফাযত করা অন্য মুমিনের দায়িত্ব হয়ে যায়। তাই সে কারও কোনো প্রকার ক্ষতির চিন্তা করে না। আকাইদ মানুষকে সে শিক্ষা দিয়ে নৈতিকতার উৎকর্ষতা দান করে।

৪. নীতি-নৈতিকতা শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের দেওয়া বিধান সর্বোচ্চে। আকাইদের শিক্ষা অনুযায়ী একজন মানুষ মানবিয় সকল গুণ-অর্জন করার সুযোগ পায়।

৫. আকাইদ মানুষকে লাগামহীন জীবন যাপন পরিহার করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। দায়িত্বহীনতা পরিহার করে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। পশু সুলভ আচরণ পরিহার করে মনুষ্যত্বের দিকে আহ্বান করে। সংকীর্ণতা পরিহার করে উদারতার শিক্ষা দেয়।

৬. আকাইদ মানুষকে মৃত্যুর পর আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের কথা শিক্ষা দেয়। পরকালে হিসাবের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং পাপ-পুণ্য তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন করা হবে। মানুষের মাঝে যদি পরকালে পাপ-পুণ্যের হিসাব দেয়ার বিশ্বাস থাকে তাহলে সে নৈতিকতা বিরোধি কোন কাজ করতে পারে না।

সুতরাং আকাইদে বিশ্বাসি একজন মানুষ মহান চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারি হয়ে নৈতিকতার মানদন্ডের শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। মহানবি বলেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ.

"উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি"। (মুয়াত্তা, আহমাদ)

অতএব, ইমান-আকিদায় বিশ্বাসি একজন মুমিন নৈতিক মূল্যবোধে সব সময় উজ্জীবিত থাকেন। তাই বলা যায়, "ইমান-আকিদায় বিশ্বাসি ব্যক্তিই নীতিবোধের উচ্চ মানদণ্ডে আসীন থাকেন।"

সারসংক্ষেপ

যে শাস্ত্রে ইসলাম সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তি নির্ভর দলিল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। তাকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা।

আকাইদ শাস্ত্রের মূল বিষয় হলো- আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে এভাবে বিশ্বাস করা যে- এগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনন্ত।

আকাইদ মানুষকে বহুত্ববাদ থেকে একত্ববাদে বিশ্বাসি হতে শেখায়। আকাইদের শিক্ষা অনুযায়ি সকল মানুষ আদম সন্তান এবং এক জাতি। আকাইদে বিশ্বাসি মানুষ নীতি-নৈতিকতায় বলিয়ান হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখে। আকাইদ মানুষকে সুশৃংখল জীবন যাপনে সাহায্য করে। আকাইদ মানুষকে আখিরাত জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলা যায় যে, ইমান আকিদায় বিশ্বাসি ব্যক্তিই নীতি-নৈকিতার উচ্চ মানদণ্ডে আসীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আকাইদ শাস্ত্রের আরেক নাম হচ্ছে-
   ক. ইলমুল কালাম খ. ইলমুল বয়ান
   গ. ইলমুল হাদিস ঘ. ইলমুল আখলাক

২. আকিদা বিষয়ক পন্ডিতগণের মতে ইসলামি আকিদার মূলনীতি কয়টি?
   ক. সাতটি খ. পাঁচটি
   গ. চারটি ঘ. তিনটি

৩. মাওঃ মানসুর বিশ্বাস করেন, "আল্লাহ এক ও একক"- তাঁর এরূপ বিশ্বাস তাঁকে করে?
   ক. ইমানদার খ. আমলদার
   গ. ধর্ম বিমুখ ঘ. পরহেযগার

৪. ইকবাল সাহেব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদায় বিশ্বাস করে ইসলামের সকল কাজ কর্ম যথাযথভাবে পালন করেন। এর ফলে আখিরাতে তিনি কী লাভ করবেন?
   ক. জাহান্নাম খ. তিরস্কার
   গ. জান্নাত ঘ. কবরে শাস্তি।

উত্তরমালা : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ

পাঠ-১৩ : রিসালাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- রিসালাতের পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- নবি-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	রিসালাত, নবি-রাসূল, মুয়াল্লিম, কিতাব, হিকমত।

রিসালাত-এর পরিচয়

রিসালাত-এর অর্থ- বার্তা, চিঠি, সংবাদ বা কোন ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। পরিভাষায় রিসালাত হচ্ছে, মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধি বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব পালন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও নবি হযরত আদম (আ) থেকে এই রিসালাতের ধারা শুরু হয়ে সর্বশেষ ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে তা শেষ হয়। নবি-রাসূলগণ ওহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী ও বিধি বিধান লাভ করে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। রিসালাতের এই মহান দায়িত্ব পালনে নবি-রাসূলগণ কোনো রকম অবহেলা বা ত্রুটি করেননি। নবি-রাসূলগণ ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁরা গুনাহ বা পাপ কাজ থেকে সব সময় মুক্ত ছিলেন। নবি-রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের উপর ফরয। নবি-রাসূলকে গালি দেওয়া এবং অশোভন মন্তব্য করলে ইমান নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন আখেরি নবি ও রাসূল। তাঁরপর আর কোন নবি-রাসূলের আগমন ঘটবে না এবং কোনো আসমানি কিতাবও অবতীর্ণ হবে না।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালার একত্বের প্রতি বিশ্বাস করা মুমিন হওয়ার জন্য যেমন অপরিহার্য; তেমনিভাবে রিসালাতে বিশ্বাস করাও অপরিহার্য। রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম। রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর ও বান্দার মাঝে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকেই অস্বীকার করা হয়। তাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি রিসালাতে বিশ্বাস করতে হয়। যেমন- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ দ্বারা আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স) এর প্রতি নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আলকুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির হিদায়াতের জন্য একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে নির্ধারিত।

নবি-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

নবি-রাসূলগণ মানব জাতির জন্য অনুসরণিয় আদর্শ। মানুষ যখন শয়তানের প্ররোচনায় সত্য পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে সৃষ্ট বস্তুর বা প্রাণির ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিরক ও কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তখনি আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষের কিসে কল্যাণ হয়, কিসে অকল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ওহির

শিক্ষা ছাড়া মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। নবি-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যবস্থাটি করেছেন।

নবি-রাসূলগণ জীবনের প্রতিটি কাজ কীভাবে হবে তা তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে মানব জাতিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِيۡكُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيۡكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ.

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তোমাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তোমাদেরকে সে বিষয়েই শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।" (সুরা আল-বাকারা ২:১৫১)

মহানবি (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا 'আমাকে শিক্ষকরূপে' প্রেরণ করা হয়েছে। (ইবনু মাজাহ)

নবি-রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধারক বাহক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ নিজেই এই বাহন ও মাধ্যমরূপে নবি-রাসূল প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوۡلُ بَلِّغۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهٗ ؕ

"হে রাসূল! আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা আপনি যথাযথভাবে প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তা হলে আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।" (সুরা আল-মায়িদা ৫:৬৭)

মানবরচিত আইন দূরদর্শী নয়। তাই, আল্লাহর দূরদর্শী আইন মানব সমাজে প্রয়োগ, প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন নবি রাসূলগণের অন্যতম কাজ।

মানব সমাজের সংস্কার করার লক্ষ্যে নবি-রাসূলগণ কাজ করেছেন। তাই নবি-রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব হলো আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা।

নবি-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর মনোনিত দ্বীন, জীবন বিধানকে অন্য সকল ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদের উপর প্রাধান্য, বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন "তিনিই স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি এ দীনকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করেন।" (সুরা আত-তাওবাহ ৯:৩৩)

সারসংক্ষেপ

রিসালাত হচ্ছে- মহান আল্লাহর বাণী ও বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব। যিনি এই দায়িত্ব পালন করেন তাকে রাসূল বলা হয়। হযরত আদম (আ) থেকে অসংখ্য নবি-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি-রাসূল ছিলেন মহানবি মুহাম্মদ (স)। তাঁর পর আর কোনো নবি-রাসূল আগমন করবেন না। ইমানদার হওয়ার জন্য এ বিশ্বাস প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে বদ্ধমূল থাকতে হবে।

নবি-রাসূলগণ ছিলেন মানব জাতির আদর্শ। তাঁরা তাঁদের উত্তম আদর্শ, উন্নত ও মহান চরিত্র দ্বারা মানব জাতিকে উন্নত চরিত্রের অধিকারি করে ইহকালে শান্তি লাভ ও পরকালে মুক্তির পাওয়ার উপযোগি করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. রিসালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক. নবি-রাসূল খ. বার্তা বা চিঠি
   গ. বার্তা-বাহক ঘ. দাওয়াত দেওয়া

২. রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কী হয়?
   ক. মানুষ মুনাফিক হয় খ. ইমান থাকে না
   গ. ফাসিক হয় ঘ. কাফির হয়।

৩. সমির আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে কিন্তু রিসালাতে বিশ্বাস করে না। তার এরূপ কাজ কীসের পরিপন্থি?
   ক. তাকওয়ার খ. ইমানের
   গ. তাওহীদের ঘ. তাকদিরের

৪. আরমান মহানবি (স)-কে শেষ নবি ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করে না। এর পরিণামে সে লাভ করবে-
   (i) জান্নাত (ii) জাহান্নাম
   (iii) সহায় সম্পদ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১.খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ii

পাঠ-১৪ : নবি-রাসূলগণের গুণাবলি ও নবুওয়াতের ধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবি-রাসূলগণের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবি-রাসূলগণ নিষ্পাপ ছিলেন-একথার প্রমাণ দিতে পারবেন।
- নবি-রাসূলগণ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারি ছিলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবুওয়াতের ধারা মহানবি মুহাম্মদ (স)-এর উপর শেষ হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক নবি-রাসূলই আল্লাহর একত্বের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন তা বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	নবি-রাসূল, শ্রেষ্ঠ মানব, মহান চরিত্র, উসওয়াতুন হাসানা, নবুওয়াত।

নবি-রাসূলগণের গুণাবলি

নবি-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর মনোনিত বান্দা। রিসালাত ও নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। সে কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাঁরা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানে-গুণে-সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁরা ছিলেন অনুকরণিয় ও অনুসরণিয় আদর্শের অধিকারি। আর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মানব জাতির মাঝে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

"তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সুরা আল-আহযাব ৩৩:২১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

নবি-রাসূলগণ ছিলেন নিষ্পাপ

নবি-রাসূলগণের দ্বারা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোনো ধরণের পাপ কাজ সংঘটিত হতো না। তাঁরা শয়তানের প্ররোচনা এবং কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। আর এজন্যই তাঁদেরকে নিষ্পাপ বলা হয়। তাঁরা আকিদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগি, লেনদেন, কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে নাফস ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা ও প্রভাব থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিলেন। তাঁরা সগিরা-কবিরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ও তাঁদের দ্বারা কোন প্রকার পাপ কাজ সাধিত হয়নি এবং নবুওয়াত লাভের পরেও নয়। নিষ্পাপ বা মাসুম হওয়া নবি রাসূলগণের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নবি-রাসূলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারি। মানবিয় উত্তম গুণাবলির সমাবেশ ছিল তাঁদের চরিত্রে। তাঁরা সব সময় সত্য কথা বলতেন। মিথ্যা তাঁদেরকে স্পর্শ ও করতে পারতো না। সত্যবাদি, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার হওয়া নবি রাসূলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ মহানবি (স.)-এর সম্পর্কে বলেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (সুরা আল-কালাম ৬৮:৪)

নবি-রাসূল হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। নবুওয়াত নারিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন নারিকে নবুওয়াত দান করেননি। নবুওয়াত কেবল পুরুষদেরই দান করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

"আপনার পূর্বেও জনপদবাসিদের মধ্য থেকে পুরুষগণকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের নিকট ওহি পাঠাতাম।" (সুরা ইউসুফ ১২:১০৯)

নবুওয়াতের ধারা

হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের ধারা শুরু করেন এবং তাঁর উপর একাধিক আসমানি পুস্তিকা বা সহিফা অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সকল সহিফার মাধ্যমে যে সকল বিধি-বিধান দেওয়া হয় তা তিনি ও তাঁর বংশধরগণ পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে কাবা ঘর নির্মাণের আদেশ দেন। তিনি কাবা ঘর নির্মাণ করে তার চারদিকে তাওয়াফ করেন এবং নামায আদায় করেন। নবুওয়াতের ধারায় তিনি হলেন প্রথম নবি ও রাসূল।

হযরত আদম (আ) এর পর আল্লাহ তায়ালা আরো অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি হযরত ইদরিস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ) হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত লুত (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত শুআইব (আ), হযরত আইয়ুব (আ), হযরত জুল কিফল (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত ইয়াসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত ইউনুস (আ), হযরত জাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং সর্বশেষ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) কে, নবি ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল-কুরআনে উক্ত পঁচিশজন নবি রাসূলের নাম বর্ণিত আছে। এ ছাড়াও অনেক নবি, রয়েছেন যাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই এবং তাদের কোন ঘটনাবলি বা কার্যক্রমেরও উল্লেখ নেই। তাঁদের উপর সামষ্টিকভাবে ইমান আনা ফরয।

সকল নবি-রাসূলই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। সত্য, সুন্দর ও ওহি লব্ধ জীবন বিধান অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (স) ছিলেন নবুওয়াতের ধারার সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবি-রাসূল আসবেন না। তাঁর মাধ্যমেই দীনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। সকল নবির উপর ইমান রাখা ফরয। নবি -রাসূল হিসেবে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোন নবি-রাসূলের মাঝে পার্থক্য করা যাবে না। কোন নবি-রাসূলকে গালি দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কবিরা গুনাহ।

সারসংক্ষেপ

নবি ও রাসূলগণ আল্লাহর মনোনিত বান্দা। তাঁরা সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। নবি-রাসূলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারি। তাঁরা ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের অনুসারি ও আমানতদার ছিলেন। নবি-রাসূল হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পুরুষ থেকেই নির্বাচন করেছেন। কোনো মহিলাকে নবুওয়াত দান করেননি।

নবুওয়াতের ধারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর উপর একাধিক সহিফা অবতীর্ণ হয়েছিল। এসকল সহিফার মাধ্যমে যে সকল বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছিল তা তিনিও তাঁর বংশধরগণ পালন করেন। নবুওয়াতের ধারায় তিনি হলেন প্রথম নবি ও রাসূল। হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি-রাসূল ছিলেন। তাঁর ওপর নবুওয়াতের ধারা খতম বা শেষ হয়েছে। এজন্য তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর মাধ্যম ইসলাম পরিপূর্ণ দীন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সকল নবি ও রাসূলের উপর ইমান আনা ফরয।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করবেন। অতঃপর প্রত্যেক গ্রুপকে নবি-রাসূলদের একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করতে বলবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাসূল শব্দের অর্থ কী?
   ক. পত্র বাহক বা বার্তাবাহক
   খ. চিঠি পৌঁছানো
   গ. দূত প্রেরণ
   ঘ. পত্র অনুসরণ

২. কোন নবি ও রাসূল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব?
   ক. হযরত মূসা (আ)
   খ. হযরত দাউদ (আ)
   গ. হযরত মুহাম্মদ (আ)
   ঘ. হযরত ঈসা (আ)

৩. "নিশ্চয় রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"- এটি কোন সুরা থেকে নেওয়া আয়াতের অনুবাদ?

(i) সুরা আল-আহযাব (ii) সুরা আল মায়িদা
(iii) সুরা আর-রহমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১.ক ২. গ ৩. ক. i

পাঠ-১৫ : সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নবি-রাসূলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবির পরিচয় বলতে পারবেন।
- খাতামুন নবুওয়াতের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- খাতামুন নবুওয়াতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	নবি-রাসূল, খাতামুন নবুওয়াত, রহমতুল্লিল আলামীন।

আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবি ও রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। প্রথম নবি ও রাসূল হযরত আদম (আ)। সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবি আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হিদায়েতের জন্য যে বিধি-বিধানের প্রয়োজন তা মহানবি (স.)-এর জীবন বিধানেই রয়েছে। কুরআন অবতরণের মধ্য দিয়ে ইসলামী জীবন বিধান পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবি

মানুষের হেদায়তের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যেসকল মহামানবকে মনোনীত করেছেন। তাঁদেরকে নবি-রাসূল বলা হয়। নবি-রাসূলের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাই আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোন নবি-রাসূল পাঠাবেন না। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবি।" (সুরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ

"আমি শেষ নবি।" (বুখারি)

কুরআন অবতরণের মধ্য দিয়েই ইসলামি জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা পেয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩)

ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করায় দুনিয়াতে তা প্রচারের জন্য আর কোন নবি-রাসূলের আগমনের প্রয়োজন নেই।

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি এমন গুণাবলির অধিকারি ছিলেন, যা অন্যান্য নবিগণের মধ্যে ছিল না। অন্যান্য নবি-রাসূলের আগমন ঘটেছিল কোন না কোন গোত্র, বিশেষ দেশ এবং নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের জন্য কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন হয়েছে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

" বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল।"(সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৮)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২১:১০৭)

কাজেই বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল বিচারে শ্রেষ্ঠ নবি।

সারসংক্ষেপ

মানব জাতির পথ প্রদর্শকরূপে পৃথিবীতে নবি-রাসূলের আগমন হয়েছে। হযরত আদম (আ) প্রথম নবি। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য তিনি বিশ্বনবি তাঁর আগমন হয়েছে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ছিলেন ?
(ক) হযরত ইসা (আ.) (খ) হযরত আদম (আ.)
(গ) হযরত মুহাম্মদ (স.) (ঘ) হযরত মুসা (আ.)

২। 'আমি শেষ নবি, আমার পরে কোনো নবি আসবে না'- এটি কার বাণী ?
(ক) হযরত দাউদ (আ.)-এর (খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর
(গ) হযরত আদম (আ.)-এর (ঘ) হযরত ইদরিস (আ.)-এর

৩। 'আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি'- এটি কোন সুরার আয়াত ?
(ক) সুরা আল-আম্বিয়া (খ) সুরা আল-বাকারা
(গ) সুরা আল-নিসা (ঘ) সুরা আলে ইমরান।

৪। হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন-
(ক) নবি (খ) শেষ নবি ও রাসুল
(গ) নবিগণের নেতা (ঘ) সব ক'টি উত্তর সঠিক

উত্তরমালা: ১.গ ২. খ ৩. ক ৪. খ

পাঠ-১৬ : খতমে নবুওয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- 'খতমে নুবওয়াত'-এর পরিচয় জানতে পারবেন;
- নবুওয়াতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন;

মুখ্যশব্দ/ Key Words	খাতামুন নাবিয়্যিন, নবুওয়াত।

خاتم 'খাতামুন' অর্থ সর্বশেষ, সীলমোহর, পরিসমাপ্তি ইত্যাদি। 'খাতামুন নাবিয়্যিন' অর্থ নবিগণের পরিসমাপ্তি। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এজন্য তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা শেষ নবি বলা হয়।

চিঠির উপর সীলমোহর লাগানো হলে এর মধ্যে নতুন করে কোন কিছু ঢুকানো যায় না এবং কোন কিছু বের করা যায় না। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত নবি-রাসূলের আগমনের ধারা বন্ধ ও শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবি।" (সুরা আল-আহযাব ৩৩ : ৪০)

নবি করিম (স.)-এর ইন্তেকালের পর কিছু লোক নিজেদেরকে নবি বলে দাবি করেছিল। তারা ভন্ড ও মিথ্যাবাদি। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ভন্ড নবিদের কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। এতে প্রমাণ হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল।

নবুওয়াতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

হযরত আদম (আ) প্রথম নবি ও রাসূল। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে অসংখ্য নবি-রাসূলের আগমন ঘটেছে। যুগে যুগে যত নবি-রাসূলের আগমন হয়েছিল সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র মনোনিত বান্দা। তাঁদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫

"রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ইমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।' (সুরা আল বাকারা, ২ : ২৮৫)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে যুগে যুগে যত নবি-রাসূলের আগমন ঘটেছে, তাঁদের সবার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অপরিহার্য শর্ত। এদের কাউকে অবিশ্বাস করা ইমানের পরিপন্থী কাজ। তাই আল্লাহ্র প্রেরিত নবি হিসেবে সকলের উপর ইমান রাখতে হবে। সবাইকে সমান মর্যাদা ও সম্মান দিতে হবে। নবি-রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করা যাবে না। তবে সকল নবি-রাসূলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে শ্রেষ্ঠ নবিরূপে স্বীকার করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাঁর আগমন হয়েছে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবি-রাসূলের আগমন প্রয়োজন হবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স,)-কে খাতামুন নবি বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। খাতামুন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সর্বশেষ
(খ) সীলমোহর
(গ) পরিসমাপ্তি
(ঘ) সবগুলো উত্তর ঠিক।

২। খতমে নবুওয়াত অর্থ কী ?

(ক) নবিদের শেষ
(খ) নবিদের শুরু
(গ) নবিদের আগমন বার্তা
(ঘ) নবিদের বিদায় বার্তা

৩। 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবি'- এটি কার বাণী ?

(ক) আল্লাহ তায়ালার
(খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর
(গ) হযরত আদম (আ.)-এর
(ঘ) হযরত ইদরিস (আ.)-এর

৪। হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন-

(ক) নবি
(খ) শেষ নবি ও রাসুল
(গ) নবিগণের নেতা
(ঘ) সব কটি উত্তর সঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরা, শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এক ছাত্র দাঁড়িয়ে শিক্ষকের নিকট জানতে চায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আরও অনেক মানুষের জন্ম হবে এবং তারা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখিন হবে। তাই ভবিষ্যতে আরও নবি ও কিতাব নাযিলের প্রয়োজন হবে কিনা। শিক্ষক ছাত্রের কথার জবাবে বললেন, পৃথিবীতে আর কোন নবি-রাসূলের আগমন ঘটবে না। কেননা সকল বিষয় ও সমস্যার সমাধান কুরআনে রয়েছে।

(ক) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ছিলেন ?
(খ) খাতামুন নবুওয়াত বলতে কি বোঝেন ?
(গ) 'হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি'-প্রমাণ করুন।
(ঘ) ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সিদ্দীক সাহেবের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনী প্রশ্ন: ১. ক ২. ক ৩.ক ৪. খ

পাঠ-১৭ : আসমানি কিতাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আসমানি কিতাব-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আসমানি কিতাব, হিদায়াত, হজরত জিবরীল (আ), তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, আল-কুরআন।

পরিচয়

আসমান অর্থ আকাশ আর কিতাব অর্থ লিখিত বস্তু। সহজ অর্থ বই-পুস্তক, গ্রন্থ ইত্যাদি। অতএব আসমানি কিতাব অর্থ আকাশ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ। সাধারণত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবই আসমানি কিতাব। ইসলামি পরিভাষায় মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণের নিকট হযরত জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে যে বাণীসমূহ প্রেরণ করেন তাই আসমানি কিতাব। যেমন- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও আল-কুরআন। অতঃপর নবি-রাসূল (আ) গণ তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেন ।

আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব

যে সকল বিষয়ে ইমান আনা আবশ্যক তন্মধ্যে আসমানি কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যতম। এতে ইমান না থাকলে কোন মানুষ মুমিন হতে পারে না। যদি কেউ আসমানি কিতাবসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে অবিশ্বাস করে, তবে স্বভাবতই সে ইমানের অন্যান্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করলো। অতএব পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে হলে আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আল-কুরআনের উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিজগত, মানবসৃষ্টি, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি।

জীবনের সকল পর্যায়ে আল-কুরআনের বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমেই রয়েছে ইহকালিন ও পরকালিন জীবনে শান্তি ও মুক্তি।

সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবি রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবই আসমানি কিতাব। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন এই চারটি বড় আসমানি গ্রন্থ। এই কিতাবসমূহের উপর ইমান রাখা অপরিহার্য। আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল-কুরআনে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। কাজেই আল-কুরআনের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির ইহকালিন ও পরকালিন শান্তি ও মুক্তি।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্বের উপর ৫টি বাক্য লিখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-

i. আল-কুরআন, ii. তাওরাত, iii. ইঞ্জিল

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. i

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা আতীক একটি ইসলামি জলসায় বললেন, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য ছোটবড় মিলিয়ে ১০৪ খানা কিতাব নাযিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। ফাহিম মাওলানা সাহেবের নিকট প্রশ্ন করলেন, আল-কুরআন বিশ্বাস করলেই তো যথেষ্ট। অন্য কিতাবসমূহে বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন? তখন মাওলানা বললেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অঙ্গ। এটি অপরিহার্য–

ক. প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব কয়টি ও কী কী?
খ. আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনা কী অপরিহার্য?
গ. ফাহিমের ধারণা কীভাবে পরিবর্তন হলো?
ঘ. আসমানি কিতাব ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহের উপর ইমান আনার অপরিহার্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: ১.গ

পাঠ-১৮ আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আল-কুরআন, হিদায়াত, জিবরাইল (আ), আরবি, লাওহে মাহফুজ, জীবনব্যবস্থা।

বিষয়বস্তু

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তিনি তা হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর উপর আরবি ভাষায় নাযিল করেন।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

কুরআন মজিদে সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব

আল-কুরআনে মানব জীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেই নি।" (সুরা আল-আনআম ৬:৩৮)

সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত

আল-কুরআন সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর কিতাব। সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এমন কোনো বিষয়ই এতে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ

"এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (সুরা আল-বাকারা ২:২)

আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত

আল-কুরআন লাওহে মাহফুয সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" (সুরা আল-হিজর ১৫:৯)

লক্ষ লক্ষ হাফিযে কুরআনের হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালা এ কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মূলত আল-কুরআন কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজন ছাড়া অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং থাকবে।

অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ

আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংযোজন বিয়োজন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

সহজ সরল ও প্রাঞ্জল রচনাশৈলি

আল-কুরআনের রচনাশৈলি চমৎকার সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। এর রচনাশৈলি পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আলাদা। এটি গদ্যও নয় আবার পদ্যও নয়। এক কথায় এর বর্ণনা অনন্য সাধারণ, যা পাঠককে বিমোহিত করে।

মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ

আল-কুরআন একটি অতীব মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। এতে মানব জাতি, ভবিষ্যদ্বাণী, বিজ্ঞান, দর্শন, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

"বরং এটি সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" (সুরা আল-বুরুজ ৮৫:২১-২২)

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী এটি সর্বপ্রকার সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত। এতে মানব জাতির সকল বিষয়ের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল-কুরআন অপরিবর্তিত গ্রন্থ। এর রচনাশৈলি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। সর্বোপরি এটি একটি অতিব মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল-কুরআন মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল-কুরআনের রচনাশৈলি সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং থাকবে। লাওহে মাহফুজে যেভাবে লিখিত আছে সেভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। মানবজাতির ইহ ও পরকালিন কল্যাণের জন্য আল-কুরআনের অনুকরণ ও অনুসরণ অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ আল-কুরআনের বৈশিষ্টের উপর ১০টি বাক্য লিখবেন এবং টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল-কুরআন কার বাণী?

ক. মহান আল্লাহর　　খ. নবি-রাসূলগণের
গ. মনীষীগণের　　ঘ. হযরত জিবরাঈল (আ)

২. আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত আছে?

ক. লাওহে মাহফুজে　　খ. মক্কা শরিফে
গ. মানুষের অন্তরে　　ঘ. মসজিদে

উত্তরমালাঃ বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ ১.ক, ২.ক।

পাঠ-১৯ : নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আসমানি কিতাবের পরিচয় বলতে পারবেন।
- নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- নৈতিক জীবন গঠনে সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আসমানি কিতাব, নৈতিক জীবন, আল-কুরআন, মুত্তাকী, আদ, সামুদ, মিথ্যাচার।

বিষয়বস্তু

নবি-রাসূলগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যে সব কিতাব লাভ করেছেন সে সব কিতাবকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সব আসমানি কিতাবের উপর ইমান রাখা ফরয। সুরা আল-বাকারার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

"এবং আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ইমান আনে।" (সুরা আল-বাকারা ২:৪)

আসমানি কিতাসমূহে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে। মানব জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির নৈতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আল-কুরআন নৈতিকতার সুফল ও অনৈতিকতার পরিণতি তুলে ধরেছে। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে ফিরআউন, নমরুদ, কারুন প্রমুখ আল্লাহদ্রোহীদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আদ, সামুদ ইত্যাদি পাপাচারী জাতিসমূহের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃজ্ঞতা, অবাধ্যতা, গর্ব-অহংকার, পাপাচার, মিথ্যাচার, অনৈতিক ও অশ্লীল কার্যকলাপের দরুন তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা আল-কুরআন ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে জানা যায়। এ সব ঘটনা আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং ন্যায় ও নৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার। যারা আল-কুরআনের জ্ঞান আহরণ করে তারাই কেবল জানতে পারে কোন কাজ নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক। তারা আরো জানতে পারে, নৈতিক জীবনযাপনের সুফল ও অনৈতিক জীবন যাপনের কুফল।

তাই নৈতিক জীবন গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। আল-কুরআনের জ্ঞান আহরণ করে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নৈতিকতার আলোয় আলোকিত করতে পারে।

আসমানি কিতাবসমূহে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি যা অনৈতিক ও ক্ষতিকর তা থেকে বেঁচে থাকার পথও তিনি বাতলে দিয়েছেন। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য আসমানি কিতাবসমূহের কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে। আল-কুরআনের দিকনির্দেশনার আলোকে নৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ।

সারসংক্ষেপ

আসমানি কিতাবসমূহে মানবজাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। মানব জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। আল কুরআন নৈতিকতার সুফল ও অনৈতিকতার পরিণতি তুলে ধরেছে। কাজেই আল-কুরআনের দিক নির্দেশনার আলোকে নৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্থ হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পার্থিব ও পরকালিন কল্যাণ।

 অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা বিষয়ে ১০টি বাক্য লিখবেন এবং টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনাব আলী ইমাম আল-কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি আল-কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করেন। এর ফলে তার জীবন হবে-

i. নৈতিকতামন্ডিত
ii. সুন্দর ও শান্তিময়
iii. সম্পদশালি ও প্রাচুর্যময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব ফারুক একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় সততা রক্ষা করেন। তিনি ফরমালিনযুক্ত ফল বিক্রি করেন না। কারণ তিনি জানেন, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন অবৈধ। আল-কুরআনে অসৎ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রনজুর অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কারণ কখনও সে কুরআন অধ্যয়ন করেনি।

১. নৈতিক মান উন্নয়নে আল-কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরুন।
২. ফারুক কেন সৎভাবে ব্যবসা করছেন।
৩. ফারুক ও রনজুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপরোক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা : বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: ১.ক

পাঠ-২০ : আখিরাত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আখিরাত বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- আখিরাত জীবনের স্তরসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আখিরাত, কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফায়াত।

আখিরাত

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ) অর্থ পরবর্তী সময়, পরবর্তী জীবন বা পরকাল। আখিরাত বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের জীবনকে বোঝায়। কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মৃত্যুর পর আখিরাত জীবনের শুরু হয়। আখিরাত জীবনের পর্যায়গুলো হলো–

ক. মৃত্যু

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের ইহকালিন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পরকালিন জীবন শুরু হয়। মৃত্যু হলো পরকালের প্রবেশদ্বার। মৃত্যুর মাধ্যমে প্রত্যেক প্রাণির জীবনাবসান ঘটে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" (সুরা আলে ইমরান ৩:১৮৫)

খ. কবর

মৃত্যুর পর থেকে হাশরের মাঠে ওঠা পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয়। এ জগতের অপর নাম আলমে বারযাখ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

"আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সুরা আল-মুমিনুন ২৩:১০০)

দাফন করার পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে মুনকার-নাকির ফেরেশতা ৩টি প্রশ্ন করেন।
এগুলো হলো–

১. مَنْ رَبُّكَ - তোমার রব কে?

২. وَمَا دِيْنُكَ - তোমার দীন কী?

৩. وَمَنْ نَبِيُّكَ - তোমার নবি কে? অথবা

وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ (মহানবি (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে) এ ব্যক্তি কে?

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও রাসূলের আনুগত্য করেছে, তাঁরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করেনি এবং নবি (স)-এর আনুগত্য করেনি তারা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাই যারা উত্তর দিতে পারবে তাদের জন্য কবরের জীবন হবে শান্তিময়। আর যারা পারবে না তাদের জীবন হবে দুঃখের ও কষ্টের।

যাদের কবর দেওয়া হয় নেই তাদেরও এ প্রশ্ন করা হবে।

গ. কিয়ামত

এ মহাবিশ্বের সকল কিছু একদিন ধ্বংস হবে। সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। এ মহাপ্রলয়ই কিয়ামত। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি খসে পড়বে। সমুদ্র উদ্বেলিত হবে। পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। ভূগর্ভস্থ সবকিছু বের হয়ে যাবে। সকল প্রাণি মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল (আ) পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবে।

ঘ. হাশর

কবর থেকে উঠে সমগ্র মানুষজাতির মহাসমাবেশকে হাশর বলে। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন হাশরের মাঠে একত্র হবে। এ দিন আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের পাপপুণ্যের প্রতিদান দেবেন। সে দিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের আমলনামা দেওয়া হবে। যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা ডানহাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে পাবে। মুমিনগণ হাশরের মাঠে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। পক্ষান্তরে পাপীরা হাশরের ময়দানে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

ঙ. মিযান

মিযান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা। হাশরের মাঠে মানুষের আমলসমূহ পরিমাপ বা ওজন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবেন তাকে মিযান বলা হয়।

চ. পুলসিরাত

বিচারের ময়দানে একটি সূক্ষ্ম সেতু থাকবে। একে 'সিরাত' বলা হয়। ঐ সেতু তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ ধারাল এবং চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম হবে। এর উপর দিয়ে সকলকে পথ অতিক্রম করতে হবে। পাপী লোকেরা তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। তারা হাত পা কেটে জাহান্নামে পতিত হবে। আর নেককার লোকেরা আল্লাহর অনুগ্রহে অতি সহজে ঐ সেতু অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

ছ. শাফাআত

কিয়ামতের দিন মানুষের বিচার শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আমল অনুযায়ি মানুষের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। তখন মহান আল্লাহ পুণ্যবানগণকে জান্নাতে ও পাপীদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। নবি-রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মূহাম্মদ (স)-এর শাফায়াতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে।

জ. জান্নাত ও জাহান্নাম

বিচারের পর আল্লাহ তায়ালা নেককার লোকদেরকে জান্নাত এবং বদকার লোকদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর যারা বিচারে সাময়িকভাবে কিছু শাস্তি ভোগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তাদেরকেও তাদের গুনাহের শাস্তি প্রদান করার পর আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দান করবেন। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই তা সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং এখনও তা বিদ্যমান। কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদীসে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া ইমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসি।" (সুরা আল-বাকারা ২:৪)

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা ভ্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

"এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করলো সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সুরা আন-নিসা ৪:১৩৬)

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও আদর্শের উপর নিজেকে সুদৃঢ় রাখার জন্য আখিরাতের উপর আস্থাশিল হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন শুরু হবে এবং সে জীবনে পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা ইহকালের কর্মকান্ডের উপরই নির্ভরশিল। এ কথার বিশ্বাসই মানুষকে পার্থিব জীবনে সত্যপথের অনুসারী বানায়। আমলে সালেহৎ-সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আখিরাতের বিশ্বাস মানব মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অসত্য পরিহার করার মনোভাবের জন্ম দেয়।

সারসংক্ষেপ

মৃত্যুর পর থেকে আখিরাত জীবনের শুরু হয়। আখিরাত জীবনের স্তরসমূহ হলো মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, পুলসিরাত, শাফায়াত, জান্নাত ও জাহান্নাম। আখিরাত বিশ্বাস মানুষকে পাপাচার, মিথ্যাচার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। আখিরাতের ভীতি ও আনন্দময় জীবনে মানুষকে সৎকর্মপরায়ণ করে। আমাদের উচিত আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে সর্বদা চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আখিরাতের স্তরসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবেন এবং পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কিয়ামত অর্থ কী?

ক. মহাপ্রলয় খ. মহাপ্লাবন

গ. মহাকম্পন ঘ. ঘূর্ণিঝড়

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাসুদ ও মামুন দুইভাই। মামুন নিয়মিত সালাত আদায় করে। সে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং বিপদগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করে। কারণ সে গভীরভাবে আখিরাত বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে মাসুদ ধর্ম কর্ম সম্পর্কে উদাসীন। কারণ আখিরাত নিয়ে তার তেমন কোন চিন্তা নেই।

ক. আখিরাত কী?

খ. মিযান কী?

গ. মামুন কেন সৎ কর্মপরায়ণ।

ঘ. মাসুদ ও মামুনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোকে মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা: বহু নির্বাচনি প্রশ্ন: ১.ক

পাঠ-২১ : জান্নাত ও জাহান্নাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় দিতে পারবেন।
- জান্নাত ও জাহান্নামের সংখ্যা বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	জান্নাত, জাহান্নাম, যাক্কুম।

জান্নাত

জান্নাত অর্থ উদ্যান, বাগান ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে তাঁর নেককার বান্দাগণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে অফুরন্ত নেয়ামত ও সুখ শান্তির স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই জান্নাত।

জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিরা এবং আল্লাহর নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা আলে ইমরান ৩:১৫)

জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে যে নিয়ামত দান করবেন সে সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ سَلٰمٌ ۗ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ .

"এ দিন জান্নাতিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেথায় থাকবে তাদের জন্য ফলমুল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু, সালাম! পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে সম্ভাষণ।" (সুরা ইয়াসীন ৩৬:৫৫-৫৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন নিয়ামতসমূহ প্রস্তুত রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনে নি এবং যা মানুষের অন্তর কল্পনাও করতে পারেনি।" (হাদিসে কুদসি)

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য আটটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. দারুল মাকাম, ৩. দারুল কারার, ৪. দারুসসালাম
৫. জান্নাতুল মাওয়া, ৬. জান্নাতু আদন, ৭. জান্নাতুন নাইম, ৮. দারুল খুলদ।

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সর্বনিম্নস্তর হলো জান্নাতু আদন। আমলের তারতম্য অনুসারে জান্নাতিগণ বিভিন্ন স্তরের জান্নাতে অবস্থান করবেন।

জাহান্নাম

কঠিন শাস্তির স্থান। সেখানে আছে ভয়াবহ আগুন। যে আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে সত্তর বেশি উত্তপ্ত হবে। জাহান্নামের অপর নাম (আগুন) نَارٌ ।

জাহান্নামের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-
"যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। যখন তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই এর স্থলে পরিবর্তে নতুন চর্ম সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আন-নিসা ১৪:৫৬)

জাহান্নামের শাস্তি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন "জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তির আযাব সবচেয়ে সহজ এবং কম হবে তার পায়ে জাহান্নামের দুটি জুতা ও ফিতা পরিয়ে দেয়া হবে। আর এ অগ্নিময় জুতার তাপ এত প্রচন্ড হবে যে, চুলার উপর হাড়ির পানি যেভাবে ফুটতে থাকে ঐভাবে তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে। তার আযাবকে কঠিন আযাব বলে ধারণা করা হবে, অথচ তার আযাব হলো সবচেয়ে কম ও হালকা। (মিশকাত শরীফ)

জাহান্নামিদের পানাহারের জন্য যে সব জিনিস সরবরাহ করা হবে, সে প্রসঙ্গে নবি করীম (স) ইরশাদ করেন, জাহান্নামীদের পান করার জন্য যে পুঁজ দেওয়া হবে এর এক বালতি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে গোটা দুনিয়াবাসি দুর্গন্ধে মারা যাবে। (মিশকাত শরীফ)

যাক্কুম বৃক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যদি যাক্কুমের এক ফোটা দুনিয়ায় পড়ে, তবে দুনিয়াবাসির সকল পানাহার দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে যাকে এ যাক্কুম পানাহার করতে দেওয়া হবে তার কী অবস্থা হবে?" (মিশকাত শরীফ)

পাপিদের শাস্তিদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা ৭টি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো-

১. জাহান্নাম ২. হাবিয়া ৩. জাহিম ৪. সাকার ৫. সাইর ৬. হুতামা ও ৭. লাযা।

কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। তা ছাড়া যাদের ইমান রয়েছে কিন্তু পাপের পরিমাণ বেশি, এমন মুমিনরাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাদের পাপের শাস্তি শেষ হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

সারসংক্ষেপ

আখিরাতের চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাত-জাহান্নাম। জান্নাত চিরস্থায়ী সুখের স্থান আর জাহান্নাম সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণার স্থান। যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের ঠিকানা জান্নাত। আর যারা কাফির ও পাপাচারি তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আমাদের উচিৎ জান্নাত লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নামের একটি তালিকা তৈরি করবেন এবং মুখস্থ করে টিউটরকে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. জান্নাত শব্দের অর্থ-

ক. পাহাড় খ. উদ্যান গ. নদী ঘ. ঝর্ণা

২. সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম কী?

ক. দারুল মাকাম খ. দারুল কারার গ. জান্নাতু আদন ঘ. জান্নাতুল ফিরদাউস

উত্তরমালা : ১.ক ২.ঘ

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মিরাজ ও নজরুল দুই বন্ধু। মিরাজ জাহান্নামের ভয়ে যাবতিয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু নজরুল মিথ্যা ও পাপ থেকে বিরত থাকে না। সে জান্নাত-জাহান্নাম বিষয়ে উদাসীন।

ক. জাহান্নামের স্তর কয়টি?

খ. আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরুন।

গ. 'জান্নাত চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা'- ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. মিরাজ ও নজরুলের আমল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করুন।